Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যে কারনে পুরুষ নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ মামুনুর রশীদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আজমিন রহমান

রোলঃ 216022392

৩০ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যে কারনে পুরুষ নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ মামুনুর রশীদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আজমিন রহমান

রোলঃ 216022392

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "যে কারনে পুরুষ নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আজমিন রহমান, আইডিঃ 216022392 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ মামুনুর রশীদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " যে কারনে পুরুষ নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: মামুনুর রশীদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ মে, ২০২৪ ইং

আজমিন রহমান

আইডিঃ 216022392

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

উৎসর্গ........6
কৃতজ্ঞতা স্বীকার........7
গবেষকের সীমাবদ্ধতা........8
প্রাককথন........9
ভুমিকা........10
কুরআন ও হাদিসের আলোকে........11
নবীজী (সাঃ) স্ত্রীদের উপর যেভাবে কর্তৃত্ব পালন করেছেন........13
পুরুষ নারীদের অভিভাবক........17
নারীদের উপর পুরুষের দায়িত্ব........22
ইসলামে নারী নেতৃত্ব কী হারাম?........32
নারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য........46
উপার্জনের দায়িত্ব কার?........49
পরিচালনার দায়িত্ব নারীদের নাকি পুরুষদের?........53
পশ্চিমা দেশে নারীবাদীদের প্রভাব........55
নারী তুমি কেনো পুরুষ হতে চাও?........56
ইসলামে নারীদের উপর পুরুষ কর্তৃত্বশীল কেন?........58
পুরুষ নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল এর কারন........61
উপসংহার........62
তথ্যসূত্র........64

উৎসর্গ

মহান রব

আমার মা-বাবা,আমার পরিবার,আমার মাদরাসার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি প্রথমে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার সৃষ্টিকর্তা মহান রাব্বুল আলামিনের প্রতি, তাঁর অসীম রহমতে ধৈর্য ধরে আমি আমার গবেষণাটি সমাপ্ত করতে পেরেছি।

আমি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার তত্ত্বাবধায়ক জনাব ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ উস্তায এবং জনাব মাওলানা মামুনুর রশীদ উস্তাষকে। গবেষণাকর্মটির প্রস্তাবনা প্রণয়ন থেকে অভিসন্দর্ভ জমা দেওয়া পর্যন্ত পুরো সময়টিতে তিনি নিরলসভাবে আমাকে নির্দেশনা দিয়ে এসেছেন। মাওলানা মামুনুর রশীদ উস্তাযের প্রতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করছি বিভিন্নভাবে গবেষণা কার্যে দিকনির্দেশনা প্রদান করার জন্য।

গবেষকের সীমাবদ্ধতা

সীমাবদ্ধতা পেরিয়ে অর্জন লক্ষ্যে সকলের ছুটে চলা। বদ্ধতায় পরিভাষিত মানবজীবনের সীমাবদ্ধতা থেকে অধিকাংশ সময় অতিক্রম করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। বদ্ধতা এঁটে যাওয়া থেকে ছুটে চলা জীবনের পরিধি থেকে বের হয়ে ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় এই পথচলা।

এই গবেষণার ক্ষেত্রেও তেমনি অনেক সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। গতিধারা বুঝা সীমাবদ্ধতা, থিসিস সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্তের সীমাবদ্ধতা এবং তেমনি আরো অনেক সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি অন্যতম সীমাবদ্ধতা ছিলো সময়ের সল্পতা। স্বল্প সময়ে কাজটি করার দরুন এই গবেষণায় কোনরূপ নিজস্বতা নেই। গবেষনাটি মৌলিক কোন কার্যক্রম নয়। আমার সীমাবদ্ধ থেকেই এই থিসিসে কোন মৌলিক গবেষণা করা আমার পক্ষ থেকে সম্ভবপর হয়নি।

বরং বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা থেকেই এটি শুধু একটি ইন্টারনেট লব্ধ ইসলামের আলোকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার তথ্য-উপাত্তের সংকলন মাত্র।

প্রাককথন

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ-র জন্য যিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি এ জগত সংসারের একচ্ছত্র অধিপতি। সৃষ্টির ক্ষুদ্র হতে বৃহৎ সবকিছুকেই বেষ্টন করে আছে প্রিয়তম প্রভুর সীমাহীন ভালোবাসা, দয়া ও রহমত। রাত-দিনের আবর্তনের প্রতিটি ক্ষণে আল্লাহ-র নিদর্শন প্রকাশ পায়। বিন্দু থেকে বিন্দু সব কিছুর ইলম সেই মহাজ্ঞানী প্রভুর আয়ত্বে রয়েছে। রাতের আঁধারে ছোট্ট পিপীলিকার পায়ের আওয়াজও তিনি শুনতে পান।

অগণিত দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদে (সা) আরাবি-এর উপর। যার নবুওয়াতি আলোকধারায় এ পৃথিবী থেকে দূরীভূত হয়েছে সব ধরনের পাপ ও যুলমাত। যার পরশে মানবজাতি খুঁজে পেয়েছে সফলতার সঠিক পথ।

শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর পূতপবিত্র পরিবারবর্গের প্রতি, তাঁর অনুসারীদের প্রতি এবং সৌভাগ্যশীল উম্মতের প্রতি। যারা সীমাহীন জুলুম-অত্যাচারের শিকার হয়েও বেছে নিয়েছেন প্রিয় নবিজি-র পথ-পন্থা, আঁকড়ে ধরে আছেন তাঁর অনুপম আদর্শ।

আল্লাহ মানবজাতিকে দু'ভাগে সৃষ্টি করেছেন-পুরুষ আর নারী। একজন পুরুষ নারী ছাড়া যেমন পরিপূর্ণ নন, ঠিক তেমনি একজন নারীও পুরুষ ছাড়া পরিপূর্ণ নন। সৃষ্টিগতভাবেই আল্লাহ এদের একজনকে অপরজনের সহায়ক এবং মুখাপেক্ষী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আল্লাহ তা'লা নারীদের কর্তৃত্ব পুরুষদের উপর অর্পিত করেছেন। স্বামীর দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

الرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِم ۚ

'পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল এজন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এজন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। (সুরা নিসা:৩৪)

ভুমিকা

ইসলামের নারীদের কর্তৃত্ব পুরুষদের কাছে সমর্পন করেছেন। সুখকর দাম্পত্য জীবন, সুশৃঙ্খল পরিবার, পরার্থপরতায় ঋদ্ধ ও সমৃদ্ধ স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন অটুট রাখার স্বার্থে ইসলাম জীবন সঙ্গী-স্বামীর ওপর কতিপয় অধিকার আরোপ করেছে। এর মধ্যে হলো দেনমোহর পরিশোধ করা, বাসস্থানের ব্যবস্থা করা,ভরন-পোষন,ইত্যাদি। মানুষ তার নিজের ও পরিবারের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে দায়বদ্ধ। পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করা তার দায়িত্ব।প্রতিটি মউসকিম পুরুষের কর্তব্য আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা, পরিবারকে সদুপদেশ দেওয়া, তাদের অধিকার রক্ষা করা। পুরুষদের পরিবারের ওপর দায়িত্ব রয়েছে তা সুষ্ঠভাবে পালন করা, তা হওয়া চাই নবীর সুন্নাহ অনুসারে। বেশির ভাগ প্রজাতিতেই দেখা যায় সমাজের নেতৃত্বের দায়িত্বটি পুরুষ জীবের ওপর থাকে। আল্লাহ এই ফিতবাতের ওপর প্রাণিকুল সৃষ্টি করেছেন। সমাজের মতো পরিবারের দেখভাল ও উন্নয়নের জন্য অভিভাবক হিসেবে পুরুষ দায়িত্ব পালন করে। পরিবার সমাজের মূল একক। যদি পরিবার দ্বীনদারির ওপর সুদৃঢ়ভাবে গয়ে ওঠে তবে সমাজও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাবে; অন্যথায় কলুষিত হতে বাধ্য।পুরুষকে আল্লাহ এ নেতৃত্ব ও দায়িত্ববোধের গুণ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এজন পরিবারের কর্তা ও অভিভাবক হিসেবে পুরুষ নারীর চেয়ে অধিক যোগ্য। প্রশ্ন আসতে পারে, কীভাবে পুরুষেরা নেতৃত্ব ও দায়িত্ববোধের দিক থেকে এগিয়ে? উত্তর হলো, আল্লাহ ও তাদের যথার্থ অভিভাবকের মতো শারীরিক ও মানসিক গড়ন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।

কুরআন ও হাদিসের আলোকে

কুরআন ও হাদিসে পুরুষ নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল তা আলোচনা করা হয়েছে, এর মধ্যে কিছু উল্লেখ্য করা হলো:
কুরআন মাজিদে আল্লাহ তা'লা বলেছে,

الرِّجَالُ قَوْمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ)

"পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল এজন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এজন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে"(সূরা নিসা:৩৪)

আল্লাহ তা'লা কুরআন কারিমে আরো বলেন,
(وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْف)

'আর নারীদের রয়েছে ন্যায়সঙ্গত অধিকার। যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষদের।'(সূরা বাকারাহ:২২৮)

হাদিসে এরশাদ হয়েছে...
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ ব্যতীত যদি অন্য কাউকে আমি সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে তার স্বামীকে সিজদা করার অনুমতি দিতাম। [তিরমিযীঃ ১১৫৯]
নারীর যাবতীয় প্রয়োজনের নিশ্চয়তা পুরুষরা নিজের উপার্জন কিংবা স্বীয় সম্পদের দ্বারা বিধান করে থাকে। মোটকথা: ইসলাম পুরুষকে নারীর নেতা বানিয়েছে। নারীর উপর কর্তব্য হচ্ছে,আল্লাহ তাকে তার স্বামীর যা আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন তার আনুগত্য করা। আর সে আনুগত্য হচ্ছে, সে স্বামীর পরিবারের প্রতি দয়াবান থাকবে, স্বামীর সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে। স্বামীর পক্ষ থেকে খরচ ও কষ্ট করার কারণে আল্লাহ স্বামীকে স্ত্রীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সবচেয়ে উত্তম নারী হল ঐ স্ত্রী যার দিকে তুমি তাকালে তোমাকে সে খুশী করে। তাকে নির্দেশ দিলে আনুগত্য করে। তুমি

তার থেকে অনুপস্থিত থাকলে সে তার নিজেকে এবং তোমার সম্পদকে হেফাযত করে। [মুসনাদে আহমাদঃ২/২৫১, ৪৩২, ৪৩৮, মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/১৬১]

সেসব স্ত্রীলোক, যারা স্বামীদের আনুগত্য করে না কিংবা যারা এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করে।আল্লাহ তা'আলা সংশোধনের জন্য পুরুষদেরকে যথাক্রমে তিনটি উপায় বাতলে দিয়েছেন। অর্থাৎ স্ত্রীদের পক্ষ থেকে যদি নাফরমানী সংঘটিত হয় কিংবা এমন আশংকা দেখা দেয়, তবে প্রথম পর্যায়ে তাদের সংশোধন হল যে, নরমভাবে তাদের বোঝাবে। যদি তাতেও বিরত না হয়, তবে দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের বিছানা নিজের থেকে পৃথক করে দেবে। যাতে এই পৃথকতার দরুন সে স্বামীর অসন্তুষ্টি উপলব্ধি করে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হতে পারে। তারপর যদি তাতেও সংশোধন না হয়, তবে মৃদুভাবে মারবে, তিরস্কার করবে। আর তার সীমা হল এই যে, শরীরে যেন সে মারধরের প্রতিক্রিয়া কিংবা যখম না হয়। কিন্তু এই পর্যায়ের শাস্তি দানকেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করেননি, বরং তিনি বলেছেনঃ ভাল লোক এমন করে না। [ইবন হিব্বানঃ ৯/৪৯৯, নং ৪১৮৯, আবু দাউদঃ ২১৪৬,ইবন মাজাহঃ ১৯৮৫) যাইহোক, এ সাধারণ মারধরের মাধ্যমেই যদি সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, তবুও উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেল।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, এক সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের কারো উপর তার স্ত্রীর কি হক আছে? রাসূল বললেনঃ তুমি খেতে পেলে তাকেও খেতে দেবে, তুমি পরিধান করলে তাকেও পরিধেয় বস্ত্র দেবে, তার চেহারায় মারবে না এবং তাকে কুৎসিৎও বানাবে না, তাকে পরিত্যাগ করলেও ঘরের মধ্যেই রাখবে। [আবু দাউদঃ২১৪২]

রসূল (সাঃ)বলেন, "আল্লাহ প্রত্যেককে তার অধীনস্থ মানুষের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবেন, সে কি তাদের ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করেছে, নাকি ধ্বংস করেছে। এভাবে তিনি মানুষকে তার পরিবারের দায়িত্ব সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করবেন।[নাসাঈ৯১৭৪]

নবীজী (সাঃ) স্ত্রীদের উপর যেভাবে কর্তৃত্ব পালন করেছেন

নবীজি (সাঃ) কে প্রকৃত পুরুষ দাবি করা যায়। প্রত্যেক মুসলমানদের উচিৎ নবীজির আদর্শে জীবন পরিচালনা করা।
নবীজির এগারোজন স্ত্রী ছিলেন-খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ, আয়িশা বিনতে আবু বাকর, হাফসা বিনতে উমার, সাওদা বিনতে যামআ আল-আমিবিয়্যাহ, যায়নাব বিনতে জাহশ আল-আসাদিয়্যা, যায়নাব বিনতে খুযায়মা আল-হিলালিয়্যা, উম্মে সালামা হিন্দ বিনতে আবু উমাইয়া আল-মাখযুমিয়্যা, উম্মে হাবীবা রামলা বিনতে আবু সুফিয়ান আল-আমাউইয়্যা, মায়মুনা বিনতে আল-হাবিস আল-হিলালিয়্যা, জুওয়াইরিয়্যা বিনতে আল-হারিস আল-মুস্তালিকিয়্যা এবং সাফিয়্যা বিনতে হুওয়াই আন-নাযিরিয়্যা রাযি.।

তাঁর মৃত্যুকালে নয়জন স্ত্রীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ তাঁর আগেই মারা যান। নবীজি ও তাঁর স্ত্রীদের সাথে সুখী জীবন কাটিয়েছেন, যা আল্লাহর বাণীতে উঠে এসেছে-"তাদের সাথে দয়ার্দ্র জীবন যাপন করো।" (আল কুরআন, ৪:১৯) 'দয়া' এখানে একটি ব্যাপকার্থক শব্দ, এর মাঝে সব কথা ও মহান আচরণ অন্তর্ভুক্ত। নবীজি (সাঃ) স্ত্রীদের সাথে ব্যবহারে সবার মাঝে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আর কেনই বা তা হবে না! তিনি নিজেই বলেছেন-"তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম সে-ই, যে তার স্ত্রীর সাথে ব্যবহারে সর্বোত্তম। নিশ্চয়ই আমি আমার স্ত্রীদের সাথে আচরণে সর্বোত্তম।"[তিরমিযি৩৮৯৫]

নবীজি (সাঃ)স্ত্রীদের সাথে আচরণে মহান-হৃদয় ছিলেন তাঁর জীবনীতে এর প্রচুর প্রমাণ দেখা যায়। আজ মানুষ যদি তাঁর পথ অনুসরণ করে তাঁর মতো স্ত্রীদের সাথে আচরণ করত, তা হলে অনেক বৈবাহিক সমস্যাবই সমাধান হয়ে যেত। বর্তমানে বৈবাহিক সমস্যার কারণে বিবাহবিচ্ছেদের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। এর সমাধানের লক্ষ্যে আমরা আল্লাহর নবীজির বৈবাহিক জীবনের দিকে তাকাব এবং দেখব কীভাবে তিনি স্ত্রীদের সাথে মধুর আনন্দদায়ক জীবন কাটিয়েছেন। কীভাবে তিনি ও তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে আচরণ করতেন? কীভাবে নবীজি তাদের ভুল উপেক্ষা করতেন? আমরাও তাঁর পথ অনুসরণ করে সেভাবেই আচরণ করব-কেননা তিনি অনুসরণীয় শ্রেষ্ঠ আদর্শ।

স্ত্রীদের সাথে কৌতুক আর হাসি-তামাশা যেমন আল্লাহর রাসূল করতেন, তেমনি উম্মাহর নারীদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে গড়ে তোলায় তাদের প্রশিক্ষণও দিয়েছেন। এ-ব্যাপারে তিনি (সাঃ)বলেন, "আল্লাহ প্রত্যেককে তার অধীনস্থ মানুষের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবেন, সে কি তাদের ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করেছে, নাকি ধ্বংস করেছে। এভাবে তিনি মানুষকে তার পরিবারের দায়িত্ব সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করবেন।[নাসাঈ৯১৭৪]

ইবনে উমার বাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজি (সাঃ)বলেন, "তোমরা প্রত্যেকেই অভিভাবক, তাই নিজ নিজ অধীনস্থদের ব্যাপারে তোমরা দায়বদ্ধ থাকবে। একজন শাসক একজন অভিভাবক, সে তার অধীনস্থদের ব্যাপারে দায়বদ্ধ। একজন পুরুষও একজন অভিভাবক, সে তার পরিবারের ব্যাপারে দায়বদ্ধ।"[বুখারী৮১৩ ও মুসলিম১৮২৯]

একজন স্বামীর দায়িত্ব তার স্ত্রীকে শিক্ষিত করা, দিকনির্দেশনা দেওয়া। ইসলাম ও জীবন সম্পর্কে স্বামী শিক্ষা না দেওয়ার কারণে অনেক নারীর জীবনে অশুভ পরিণতি দেখা দিয়েছে। হয়তো যথার্থ শিক্ষা ও পথনির্দেশ পেলে তারা এ-দুনিয়া ও আখিরাত- দুই জগতেই উপকৃত হতে পারত।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ)তাঁর স্ত্রীদের আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করার ব্যাপারে শেখাতেন। যখনই আকাশ মেঘে ছেয়ে যেত বা ঝড় উঠত, তখনই তিনি বারবার ঘরে ভেতরে-বাইরে যাওয়া আসা করতেন এবং তাঁর চেহারার রঙ বদলে যেত।

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, "অন্ধকার মেঘ বা ঝড় দেখলেই নবীজির(সাঃ) চেহারায় ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠত। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আল্লাহর রাসূল(সাঃ), মানুষ যে বৃষ্টি আসবে ভেবে কালো মেঘ দেখে খুশি হয়। কিন্তু আমি আপনার চেহারায় অনেক ভা দেখতে পাচ্ছি।' তিনি বললেন, 'আয়িশা, আমার ভয় হয় (মেঘে করে) আমাদের। জন্য শাস্তি আসছে, যেভাবে (পূর্ববর্তী) জাতির জন্য শাস্তি আসত; আর তারা তা দেখে। বলত, 'এটি তো আমাদের জন্য বৃষ্টি নিয়ে এসেছে, এমন মেঘ!'" (আল কুরআন, ৪৬ :২৪) [বুখারীর ৪৮২৯ ও মুসলিম৮৯৯]

নবীজি (সাঃ)পরিবারে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে কীভাবে কাজ করেছেন তার বিবরণ এ ঘটনায় পাওয়া যায়-

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. এ-ঘটনা বর্ণনা করেন, "আবু বাকর রাযি. এসে রাসূলুল্লাহর নিকটে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনি তার দরজায় অনেক লোককে বসাবস্থায় দেখলেন। তবে তাদের কাউকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়নি।" তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, "এরপর তিনি আবু বাকরকে রাযি. প্রবেশের অনুমতি প্রদান করলে তিনি প্রবেশ করলেন। এরপর উমার রাযি. এলেন এবং তিনি অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তখন তাকেও প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হলো। তিনি নবীজিকে চিন্তাযুক্ত ও নীরব বসে থাকতে দেখলেন। তার চারপাশে তার সহধর্মিণীগণ বসে ছিলেন।" (পর্দার আয়াত নাযিলের পূর্বের ঘটনা) তিনি (বর্ণনাকারী জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি.) বলেন, "উমার রাযি, বললেন, 'নিশ্চয়ই আমি নবীজির নিকটে এমন কথা বলব, যা তাকে হাসাবে।' এরপর তিনি বললেন, 'আল্লাহর রাসূল, আপনি যদি খারিজার কন্যাকে (উমরের রাযি.-এর স্ত্রী) আমার কাছে খোরপোশ (হাতখরচ) তলব করতে দেখতেন, তা হলে (তৎক্ষণাৎ) আপনি তার দিকে অগ্রসর হয়ে তার কাঁধে আঘাত করতেন। তখন রাসূলুল্লাহ হেসে উঠলেন এবং বললেন, 'আমার চারপাশে তোমরা যাদের দেখতে পাচ্ছ, তারা আমার কাছে খোরপোশ দাবি করছে।' অমনি আবু বাকর রাযি, আয়িশা রাযি.-এর দিকে ছুটলেন এবং তার ঘাড়ে আঘাত করলেন। উমারও রাযি., দাঁড়িয়ে গেলেন এবং হাফসার রাযি. দিকে অগ্রসর হয়ে তার ঘাড়ে আঘাত করলেন। তারা উভয়ে বললেন, 'তোমরা নবীজির কাছে এমন জিনিস দাবি করছ, যা তার কাছে নেই।' তখন তারা (নবীজির সহধর্মিণীগণ) বললেন, 'আল্লাহর কসম, আমরা আর কখনো রাসূলুল্লাহর কাছে এমন জিনিস চাইব না, যা তার কাছে নেই।'

এরপর এ-আয়াত নাযিল হলো-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ لمْ تَكُنْ سَمَامًا جَمِيلًا (٢٨) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا

"হে নবীজি, আপনি আপনার সহধর্মিণীদের বলে দিন, তোমরা যদি পাখির জীবনে ভোগ ও বিলাসিতা কামনা কর, তা হলে এসো আমি তোমাদের ভোগবিলাসের ব্যবস্থ

করে দিই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদের বিদায় করে দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও পরকালকে কামনা কর, তা হলে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ, আল্লাহ তাদের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।" (আল কুরআন, ৩৩/ ২৮০)

তিনি(সাঃ) আয়িশাকে রাযি, দিয়ে (আয়াতের নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে) শুরু করলেন। তিনি বললেন, "আয়িশা, আমি তোমার সাথে একটি (গুরুত্বপূর্ণ) বিষত আলাপ করতে চাই। তবে সে-বিষয়ে তোমার পিতামাতার সঙ্গে পরামর্শ না করে তোমার ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করাই আমি পছন্দ করি।" তিনি বললেন, "আল্লাহর রাসূল, আপনার ব্যাপারে আমি কি আমার পিতামাতার কাছে পরামর্শ নিতে যাব? (এর কোনে প্রয়োজন নেই) বরং আমি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখিরাতকেই বেছে নিয়েছি। তবে আপনার কাছে আমার একান্ত নিবেদন, আমি যা বলেছি, সে-সম্পর্কে আপনি আপনার অন্যান্য স্ত্রীদের কারও কাছে ব্যক্ত করবেন না।' তিনি বললেন, "তাদের যে-কেউ সে- বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি অবশ্যই তাকে বলে দেব। কারণ আল্লাহ আমাকে কঠোরতা আরোপকারী ও অত্যাচারীরূপে নয়, বরং সহজ পন্থায় (শিক্ষাদানকারী) হিসেবে প্রেরণ করেছেন।" এরপর বাকি স্ত্রীদেরও একই ব্যাপার বলা হলো এবং তারাও আয়িশার মতো একই উত্তর দিলেন।'[মুসলিম১৪৭৮]

নবীজি এবং তাঁর স্ত্রীগণ পরিবারে একে অপরের সাথে সর্বোত্তম আচরণ বজায় রাখতেন। পরিবারে তাদের সবার আচরণ এবং নৈতিকতা উম্মাহর জন্য অনুসরণীয় আদর্শ। নবীজি (সাঃ)সব সময় চেষ্টা করতেন তাঁর প্রতিটি ভূমিকায় ন্যায়ানুগ আচরণ করার। এমনকি পারিবারিক জটিলতার মুহূর্তগুলোতেও তিনি যথাযথভাবে একজন আদর্শ স্বামীর ভূমিকা পালন করেছেন।

প্রতিটি মুসলিমের উচিৎ রাসূলকে (সাঃ) অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা। স্ত্রীর সাথে কথা বলায় ও আচরণে ধৈর্য, শ্রদ্ধা, সম্মান, ভালোবাসা ও সহনশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে তাঁকে অনুসরণ করা। এ-ক্ষেত্রে আমাদের সফলতা বা ব্যর্থতা আমাদের আখলাক ও ঈমানের প্রকৃত অবস্থাকেই তুলে ধরবে।

পুরুষ নারীদের অভিভাবক

কুরআন মাজিদে আল্লাহ তা'লা বলেছে,

الرِّجَالُ قَوْمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল এজন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এজন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে"(সূরা নিসা:৩৪)

পুরুষেরা নারীদের অভিভাবক ও রক্ষক বলতে কী বোঝায়? প্রশ্নটির উত্তরে আমাদের প্রথমেই সেই আরবি শব্দটি দেখতে হবে, যার অনুবাদ আমরা করছি "অভিভাবক ও রক্ষক"। শব্দটি হলো "ক্বাওয়ামুন", যা "ক্বাওয়াম" শব্দের বহুবচন।

"ক্বাওয়াম" শব্দটি "ক্বাইয়িম" শব্দের জোরালো রূপ, যার অর্থ ব্যবস্থাপক। কোনো জনপদের ক্বাইয়িম বলতে বোঝায় যিনি তাদের ব্যবস্থাপনা করেন এবং তাদের কাজের দিকনির্দেশনা দেন। একইভাবে একজন নারীর ক্বাইয়িম হবেন তার স্বামী অথবা তার অভিভাবক, যিনি তার দেখাশোনা করেন এবং তার প্রয়োজন পূরণ করা নিশ্চিত করেন।

যখন আল্লাহ্ বলেন, "পুরুষ নারীর ক্বাওয়ামুন..." এর অর্থ দাঁড়ায় যে, পুরুষেরা নারীদের কাজের বিষয়ে দায়িত্বশীল এবং তাদের অধীনস্থ নারীদের বিষয়ে দায়বদ্ধ। আল্লাহ্ই সর্বোত্তম জানেন। সুতরাং, একজন স্বামী তার স্ত্রীর ভরণপোষণ,মানুষ মনে করে যে, এর অর্থ হলো স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি রুক্ষ আচরণ করবে, স্ত্রীকে স্বামীর ইচ্ছা অনুযায়ী চলতে বাধ্য করবে, স্ত্রীর নিজস্বতাকে খর্ব করবে, এবং হিংস্রভাবে তার পরিচয় অস্বীকার করবে। আসলে বিষয়টা মোটেও এরকম নয়।

পুরুষের অভিভাবক ও রক্ষক হওয়ার বিষয়টা সম্পূর্ণ দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা; খুব বেশি কর্তৃত্বের অবস্থা না। তাকে তার কাজের ব্যপারে বুদ্ধিবৃত্তিক ও চিন্তার উৎকর্ষতা দেখাতে হয় এবং ধৈর্যের পরিচয় দিতে হয়।

আয়াতটি থেকে আমরা পুরুষদের উপর এই গুরুভার দেওয়ার দুইটি কারণ পাই। আল্লাহ্ বলেন, "...এ কারণে যে, আল্লাহ্ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন..." এবং "...এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে।" নারীদের উপর পুরুষের প্রাধান্যের কথা বললে একটা সমস্যার উদ্ভব হয়। যেসকল সংস্থা, স্থাপনা এবং কর্মীরা নারীদের সমতার কথা বলে, তারা তখন সক্রিয় হয়ে উঠে ও ঝগড়া করার জন্য তৈরী হয়ে যায়। তারপর তাদের সকল চরমপন্থী কথাবার্তা প্রকাশ করতে শুরু করে। বরং তাদের একটু শান্ত হয়ে চিন্তা করার দরকার যে, আল্লাহ্ "...এ কারণে যে, আল্লাহ্ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন..." বলতে কী বুঝিয়েছেন। এর সঠিক ব্যাখ্যা কেবল কুরআন ও হাদীসের আলোকে এবং তার যথাযথ প্রয়োগ থেকে বোঝা যাবে।কুরআনের তাফসীর বিশারদগণ এই ব্যপারে দুটি মতে অগ্রসর হয়েছেন।

প্রথম মত হলো, এই আয়াতটি নারী-পুরুষের প্রাকৃতিক গড়নের দিকে নির্দেশ করে। নারী- পুরুষের বুদ্ধিবৃত্তিক, চিন্তাগত এবং সহজাত বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যের দিকে নির্দেশ করে। তাঁদের মতে, পুরুষেরা সহজাতভাবে রগচটা, শক্তিশালী ও কঠোর স্বভাবের; অপরদিকে নারীরা সহজাতভাবে ঠাণ্ডা প্রকৃতির, নম্র ও দুর্বল স্বভাবের।

দ্বিতীয় মতে, বিষয়টিকে একটু শার'ঈ বিধি- বিধানের দিক থেকে দেখা হয়। যেমন, আল্লাহ্ পুরুষদের উপর বিয়ের জন্য নারীদেরকে মোহর প্রদান বাধ্যতামূলক করেছেন। নারীদের প্রয়োজনীয় খরচের জন্য পুরুষকে দায়িত্বশীল করেছেন। পুরুষেরা এই দিক থেকে নারীদের উপর প্রাধান্য রাখে। অনুরূপভাবে, আল্লাহ্ কেবল পুরুষদের মাঝেই নবুওয়্যাত সীমাবদ্ধ রেখেছেন। কোনো নারী কখনো নবী ছিলেন না। অনুরূপভাবে, আল্লাহ্ সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং জিহাদের দায়িত্ব কেবল পুরুষদের জন্য রেখেছেন।

আল্লাহ্ বলেন,

"দুজন সাক্ষী কর, তোমাদের পুরুষদের মধ্যে থেকে। যদি দুজন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা। ঐ সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর; যাতে একজন যদি ভুলে যায়, তবে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়।" [সূরাহ আল- বাক্বারাহ (২): ২৮২]

এই মত পোষণকারীগণের একাংশ আবার বিষয়টিকে কিছু ইবাদাতের কাজের সাথে সম্পৃক্ততা হিসেবে দেখেছেন। যেমন জুমু'আর সালাত এবং জামা'আতের সালাত কেবল পুরুষদের জন্য বাধ্যতামূলক, নারীদের জন্য নয়। এছাড়া একজন পুরুষের একইসাথে চারজন স্ত্রী রাখার অনুমতি আছে, যেখানে একজন নারী একইসাথে কেবল একজন স্বামীর স্ত্রী হতে পারবেন। আবার পুরুষের তাৎক্ষণিক তালাক প্রদানের ক্ষমতা রয়েছে। এগুলোকেও আয়াতটির ব্যাখ্যা হিসেবে ধরা হয়।

উপরোক্ত দুটি দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে আমরা দুটি অনুসিদ্ধান্ত পেতে পারি-

প্রথমত, উভয় পক্ষই একটি বিষয়ে একমত যে, আল্লাহ্ কথামতো নারীদের উপর পুরুষের প্রাধান্য আছে "...এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে।"

দ্বিতীয়ত, উভয় পক্ষের মুফাসসিরগণ এই আয়াতটির ব্যাখ্যা নিজস্ব ইজতিহাদ থেকে বুঝেছেন। উভয়ক্ষেত্রেই এটা বলা যথার্থ হবে যে, আল্লাহ্ অবশ্যই পুরুষদের কিছু বিষয়ে আলাদা করেছেন। যেমন- নবুওয়্যাত, সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ক্ষমতা, জিহাদ এবং সামরিক কার্যকলাপ। এসবের কারণ হলো নারী-পুরুষের স্বভাবের ভিন্নতা। বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন সকলেই এই সিদ্ধান্তে একমত হবেন। ইসলাম যে নারীদের নিরাপত্তা ও তাদের প্রতিপালনের দায়িত্ব পুরুষের ওপর আরোপ করেছে, তার যথার্থতা বুঝতে হলে নারী-পুরুষের স্বভাবের ভিন্নতা বিবেচনায় আনতে হবে। আর এই বিধানের উদ্দেশ্য হলো নারীদের সর্বোচ্চ স্বার্থ রক্ষা করা।

আল্লাহ্ বিধানসমূহ সর্বদা সহজাত প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। মানবজাতির দুই অংশ তথা নারী ও পুরুষকে আলাদা আলাদা গুণাবলি উপহার দেওয়া হয়েছে, যা নিজ নিজ ক্ষেত্রে অনন্য। ইসলামের বিধান সেসব গুণাবলির সর্বোচ্চ কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করে।

আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে, নারী-পুরুষ উভয়ই আল্লাহ্ সৃষ্টি। এবং আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির উপর কখনো অবিচার করবেন না। তিনি তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিকে তিনি যেই উদ্দেশ্যে

সৃষ্টি করেছেন, সেই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তৈরী করেন। আর তার মাঝে সেই সকল সহজাত যোগ্যতা দান করেন, যা সেই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রয়োজন।

আল্লাহ্ নারীদের জন্য এই বিশেষ যোগ্যতা দিয়েছেন যে, তারা গর্ভবতী হয়, সন্তান ধারণ করে এবং তাদের লালনপালন করে। অতএব, নারী সহজাতভাবেই নারী-পুরুষের মিলনের ফলে উৎপন্ন মাখলুকটির যত্ন নেয়ার দায়ভার প্রাপ্ত। আর এটি কিন্তু একটি বিশাল দায়িত্ব। এটি কেবল একটি গুরুদায়িত্বই নয়, বরং একইসাথে বেশ স্পর্শকাতর দায়িত্বও বটে। আল্লাহ্ নারীদের বিশেষ কিছু শারিরীক, মানসিক ও আবেগীয় বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন। সেসবের গুরুত্ব উড়িয়ে দিয়েই যে কেউ সন্তান লালন-পালন করতে পারবে, এত সহজ নয় বিষয়টা।

অতএব এটিই স্বাভাবিক যে, নারীদের প্রয়োজন পূরণের এবং তাদের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব আল্লাহ্ মানবজাতির অপর অর্ধাংশের তথা পুরুষের উপরই ন্যস্ত করবেন। সেইসাথে তিনি পুরুষদের সহজাত স্বভাব হিসেবে তাদেরকে সেসকল শারিরীক, মানসিক এবং আবেগীয় গুণাবলি দান করবেন, যা এ দায়িত্ব পালনে প্রয়োজনীয়। আর এই দায়িত্ব পালনে যেহেতু

টাকাপয়সার ব্যাপারস্যাপার আছেই, তাই আল্লাহ্ অবশ্যই পুরুষদের উপর তাদের অধীনস্থ নারীদের অর্থনৈতিক দায়িত্ব ন্যস্ত করবেন। এই দুটি বিষয়ে মূলত আয়াতটিতে আলোকপাত করা হয়েছে।

এদিকে একটি মজার বিষয় আছে। যেসব মুফাসসির শার'ঈ বিধি-বিধানের দিক থেকে ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁদের দেওয়া উদাহরণগুলোও পুরুষের উপরোক্ত সহজাত স্বভাবেরই ফল। নবুওয়্যাত, সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ক্ষমতা, সামরিক দায়িত্ব, আযান দেওয়া, জামাতে সালাত আদায় করা এই সকল দায়িত্ব পুরুষদেরই মানায়। কারণ তারা গৃহস্থালির দায়িত্বে ব্যস্ত না, যা কি না তাদের এসকল কাজে বাধা দিবে।

যদিও নবুওয়্যাত হলো সম্মানের সর্বোচ্চ পর্যায়, কিন্তু এই সম্মান পুরুষের অভিভাবক ও রক্ষক হওয়ার 'কারণ' নয়। তেমনি আযান, সালাতের ইমামতি, এবং জুমু'আর

খুতবা এসব পুরুষদের দেওয়া হয়েছে ইসলামিক শারি'আতের ভিত্তিতে। কিন্তু এগুলোর ফলে নারীর উপর পুরুষের আলাদা কোনো 'সম্মান' প্রতিষ্ঠিত হয় না। আল্লাহ্ যদি এই দায়িত্বসমূহ নারীদের উপর আরোপ করতেন, তাহলেও অভিভাবক ও রক্ষকের দায়িত্ব পুরুষের উপর থেকেই যেত। অর্থাৎ, পুরুষেরা নারীদের অভিভাবক ও রক্ষক হয়েছে তাদের সৃষ্টিগত প্রকৃতির কারণে। আলাদা কোনো সম্মানের কারণে না। আবারও বলছি যে, পুরুষের এই দায়িত্ব কিছুতেই নারীদের নিজস্ব পরিচয়কে অস্বীকার করে না, হোক সেটা ঘরের ভিতর অথবা ঘরের বাইরে সমাজে। এটা কেবল এমন একটি দায়িত্ব যা পারিবারিক পরিবেশে পুরুষদের পালন করতে হয়, যাতে পরিবার নামক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠানটিকে যথাযথভাবে টিকিয়ে রাখা যায়। কোনো প্রতিষ্ঠানে একজন ম্যানেজারের উপস্থিতি তার অধীনস্থ কর্মকর্তাদের ব্যক্তিপরিচয়কে অস্বীকার করে না অথবা তাদের অধিকার খর্ব করে না। অভিভাবকত্ব ও রক্ষকের দায়িত্ব কী কী, ইসলাম তা স্পষ্টভাবে বলে দেয়।

নারীদের উপর পুরুষের দায়িত্ব

প্রকৃত পুরুষ রাসুলুল্লাহ-এর আদর্শ মেনে চলে। এতেই সমাজে একজন সফল হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায়। ইসলামিক জীবন ব্যবস্থার জন্য মেনে চলতে হবে রাসূলুল্লাহ-কে অনুসরন করে। তেমন ভাবে ইসলামে পুরুষদের উপর নারীদের অনেক বিষয়ের উপর দায়িত্ব ধার্তব্য করেছেন। বিবাহিত পুরুষের অনেক কর্তব্য রয়েছে, যা না করলেই নয়।একজন নারীর দেনমোহর, বাসস্থান, পোষাক,খাদ্য এইসব মৌলিক অধিকার রক্ষা করা পুরুষের দায়িত্ব।

- দেন মোহরানার: স্ত্রীর এ অধিকার সম্পর্কে অনেক স্বামীই জেনেশুনে বা অজ্ঞতার কারণে উদাসীন থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

"আর তোমরা নারীদের তাদের মোহরানা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রদান করবে। সন্তুষ্টচিত্রে তারা মোহরানার কিছু অংশ ছেড়ে দিলে তোমরা তা স্বচ্ছন্দে ভোগ করাব।' (সুরা নিসা, ৪)

মোহরানা হচ্ছে নারীর একক অধিকার। অন্য কারও জন্য তাতে হস্তক্ষেপ জায়েজ নয়। তার আন্তরিক সন্তুষ্টি ও সম্মতি ব্যতীত অন্য কারও জন্য তা নেওয়ার অনুমতি নেই। হ্যাঁ, চাপ প্রয়োগ, লজ্জা প্রদান বা প্রতারিতকরণ ব্যতীত তার সন্তুষ্টিসাপেক্ষে কিছু পাওয়া গেলে তা হালাল এবং তাতে গোনাহ হবে না।

স্ত্রী সম্মতি প্রদান করলে স্বামী পূর্ণ বা আংশিক মোহরানা বিলম্বিত করতে পারে। কিন্তু আদায়ের সময় নির্ধারণ করে নেবে। যদি সময় নির্ধারণ ব্যতিরেকে তার সঙ্গে সহযাপন করে, তাহলে তা স্বামীর জিম্মায় ঋণ সাব্যস্ত হবে এবং তা আদায় করা তার জন্য আবশ্যক হবে। এ অবস্থায় স্বামীর মৃত্যু হয়ে গেলে তার মিরাস থেকে স্ত্রীর তা পাওয়ার অধিকার থাকবে। আর যদি স্ত্রীর মৃত্যু হয়, তাহলে স্বামীর কাছ থেকে তা চেয়ে নেওয়ার অধিকার স্ত্রীর ওয়ারিশদের থাকবে। এটি এমন ঋণ, যা আদায় করা স্বামীর ওপর ওয়াজিব। স্ত্রী মাফ করে দিলেও তার জিম্মা থেকে এটি সরতে পারে না

অতএব স্বামীর প্রতি আমার উপদেশ হলো, মোহরানা আদায় করার ক্ষমতা না থাকলে তা ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য স্ত্রীর ওপর কোনো চাপ প্রয়োগ করবে না। তাকে লজ্জিত বা প্রতারিত করবে না; বরং তাকে সন্তুষ্ট রেখে তার কাছে তা ক্ষমা করে দেওয়ার বিনীত আবেদন করবে। এ ক্ষেত্রে শেষ উপদেশ হলো আল্লাহ তাআলার এই বাণী:

وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيظًا

'আরে কীরূপে তোমরা তা গ্রহণ করবে, যেখানে তোমরা একে অপরের সঙ্গে সংগত হয়েছ এবং তারা তোমাদের কাছ থেকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিয়েছে?" (সূরা নিসা, ৪ ২০-২১)

▢ বাসস্থান: মা,স্ত্রী,কন্যা সন্তানের জন্য বাসস্থানের সুব্যবস্থা করা একজন পুরুষের অন্যতম দায়িত্ব। পর্দার বিধান পালনে সাহায্য করা একজন প্রকৃত মুমিন পুরুষের কাজ। 'নিরাপদ বাসস্থান।' স্বামী স্ত্রীকে থাকার জন এমন একটি ঘর বা কক্ষ দেবেন, যে ঘর বা কক্ষে স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া স্বামী বাহীর কেউ প্রবেশ করতে পারবেন না। এমনকি স্বামীর মা-বাবা, ভাইবোনও না। স্ত্রীর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা রক্ষার স্বার্থে প্রয়োজনে এই ঘরে বা কক্ষে তিনি তালাচাবিও ব্যবহার করতে পারবেন। স্ত্রীর ব্যক্তিগত বা গোপন বিষয়ে স্বামী হায় কেউই নাক গলাতে পারবে না। স্ত্রীর জিনিসপত্রে স্বামী ছাড়া কেউ হাতও দিয়ে পারবে না। কোনো স্ত্রীর চলাফেরা বা আচার-আচরণ শ্বশুর-শাশুড়ির অপছন্দ হতে তাকে আলাদা বাড়ি বা ঘর করে দেওয়া উচিত। স্ত্রীর ব্যবহৃত কাপড়চোপড় ধোয়ার ব্যবস্থাও স্বামীকেই করতে হবে এবং ঘরের কাজকর্মের জন্য একজন কাজের লোকও রাখবেন স্বামী। তবে স্বামীর সংসারে স্ত্রী কাজকর্ম করলে নফল ইবাদতের সওয়ার পাবেন। অসচ্ছল ও অভাবী স্বামীর সংসারে স্ত্রী কাজকর্ম করে স্বামীর উপার্জনে সহায়তা করাই মানবিক দাবি। স্ত্রীর অন্যান্য যেসব অধিকার আছে তা হলো:

◇ স্ত্রীর সাথে সর্বদা ভালো আচরণ করা।

◇ স্ত্রীর বিছানার হক আদায় করা।

◇ স্ত্রীর কোনো কথায় বা কাজে কষ্ট পেলে ধৈর্যধারণ করা। তার দোষত্রুটি ক্ষমা করা

◇ উচ্ছৃঙ্খল, দ্বীনবিরোধী চলাফেরা করতে থাকলে নম্র ভাষায় তাকে বোঝানো।।

◇ সামান্য বিষয় নিয়ে স্ত্রীর সাথে ঝগড়া-বিবাদ না করা। ধমক না দেওয়া। রাগ নাকরা।

◇ স্ত্রীর আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে এমন বিষয়ে সংযত থাকা।

◇ স্ত্রীর প্রতি কুধারণা না করা। স্ত্রীর প্রতি উদাসীন না থাকা।

◇ স্ত্রীর সাথে মেলামেশার চিত্র অন্যের কাছে বর্ণনা না করা।

◇ নিরুপায় না হলে তালাক না দেওয়া।

◇ জরুরি হয়ে পড়লে শরীয়তসম্মতভাবে উত্তম পন্থায় তালাক দেওয়া।

এ ছাড়াও স্ত্রীর সাথে আচরণের যে উদাহরণ আল্লাহর রাসুলের জীবনে বিদ্যমান, তা থেকে প্রতীয়মান হয়, স্ত্রীর সাথে একজন পুরুষের আচরণ হবে সবচেয়ে সুন্দর। তাকে ভালোবাসবে, কেউ জিজ্ঞেস করলে নির্দ্বিধায় বলবে 'আমি তাকে ভালোবাসি'। যেভাবে নবিজি বলেছেন।

'ইয়া রাসুলুল্লাহ, কাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন?'
'আয়েশাকে।'
'তারপর?'
'আয়েশার পিতাকে।'
স্ত্রীকে এতটাই ভালোবাসতেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কখনো রূঢ় আচরণ করতেন না। বিদায় হজের ভাষণে নবিজি বলেন, 'তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো।'[সহীহ মুসলিম]

আর উত্তম মানুষের উদাহরণ দিতে গিয়ে নবিজি বলেন,

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বাধিক উত্তম, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম। আর আমি আমার পরিবারের জন্য সবার চেয়ে উত্তম।'' [সুনানুত তিরমিজি,ইবনে মাজাহ]

নিজের পরিবারের দেখাশোনা করা এবং তাদের বিভিন্ন ব্যয়ভার বহন করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এটা তো বরং আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা ও দান-সদকার চাইতেও অধিক পুণ্যের কাজ।

আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ বলেছেন:

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٍ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

'আল্লাহর রাস্তায় তুমি একটি দিনার খরচ করলে, গোলাম আজাদের জন্য একটি দিনার খরচ করলে, মিসকিনকে দান করার জন্য একটি দিনার খরচ করলে আর নিজ পরিবারের জন্য একটি দিনার খরচ করলে; এর মধ্যে পরিবারের জন্য খরচকৃত দিনারের প্রতিদান সবচেয়ে বেশি হবে। '[সহিহ মুসলিম: ২/৬৯২, হা. নং ৯৯৫ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত]

▫ পোষাক :সুশীল পোষাক নির্বাচন করা পুরুষদের দায়িত্ব। ঘরের স্ত্রী, সন্তান শালীনতার সাথে পোষাক পরা অত্যাবশকীয়। পর্দার দিকে যাতে কোনোভাবে ব্যাঘাত না ঘটে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ঘরে এবং বাহিরে সঠিক পোষাক নিশ্চিত করা।

▫ খাদ্য: যখন একজন নারীকে বিবাহ করে ঘরে আনা হয়, তার আগেই খাদ্যের সুব্যবস্থা করা জরুরি। হালার রিজিকের ব্যবস্থা করা চাই। খাদ্য একটি মৌলিক চাহিদা,তা পূরন করা, প্রতিনিয়ত আল্লাহর কাছে হালাল রিযিকের জন্য দোয়া করা অত্যন্ত জরুরি। মৌলিক চাহিদার প্রথমটি হলো 'খাদ্য।' স্বামীর সামর্থ্য অনুযায়ী প্রমোই

বিতো উপযুক্ত খাদ্য যথাসময়ে স্ত্রীকে দিতে হবে বা ব্যবস্থা করে দিতে হবে। মোতায় মৌলিক চাহিদা হলো 'পোশাক।' স্বামী স্ত্রীকে স্বীয় সামর্থ্য অনুসারে ইর প্রমেডিক্রীম তো তার যোগ্য পোশাক দেবেন। প্রয়োজনীয় পোশাক প্রদান করা যেতে স্বামীর দায়িত্ব, তাই সে পোশাক প্রস্তুত করার ব্যয়ও স্বামীর ওপরই বর্তাবে।

□ সন্তান লালন পালন :সন্তানের উত্তম লালনপালনের দায়িত্বটি মাতা-পিতার ওপর অর্পিত একটি বড় আমানত। এটি এমন এক আমানত, সর্বদাই যার ব্যাপারে খেয়াল-খবর রাখতে হয়। এটি একটি গুরুভার দায়িত্ব। প্রতিটি পদে পদে তাদের খেয়াল রাখতে হবে যে, তাদের দ্বারা কোনো ভুল হয়ে যায় কিনা, সন্তানের প্রতিপালনে কোথাও কোনো কমতি হচ্ছে কিনা।

সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে ছেলে সন্তানকে মেয়ে সন্তানের ওপর প্রাধান্য দেওয়া বর্জনীয় ও চরম নিন্দনীয়। কেননা, রাসুলুল্লাহ সন্তানদের মাঝে ন্যায়পরায়ণতা, সমতা রক্ষা করতে আদেশ করেছেন। তাদের মাঝে পার্থক্য করতে বা একজনকে অপরজনের ওপর প্রাধান্য দিতে নিষেধ করেছেন।

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ বলেছেন:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثَى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا، قَالَ يَعْنِي الذُّكُورَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ

'যার কোনো মেয়ে সন্তান থাকবে, যাকে সে জীবন্ত প্রোথিত করেনি, অপমানিত করেনি, তার ওপর ছেলে সন্তানকে প্রাধান্য দেয়নি-আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। '[৬০৫. সুনানু আবি দাউদ: ৪/৩৩৭, হা. নং ৫১৪৬ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত)- হাদিসটি জইফ।]

ইসলাম নারীদের যে সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে, অন্য কোনো মতাদর্শ, অন্য কোনো ধর্ম তা দিতে অক্ষম। এমনকি তারা অনেকে তো নারীদের মানুষই মনে করে না! কিন্তু ইসলাম নারীদের সম্মান ও মর্যাদার আসনে সমাসীন করে তাদের দিয়েছে এক উন্নত স্থান। সে হিসাবে ইসলাম মেয়ে সন্তানকে সুন্দর ও উত্তমভাবে প্রতিপালন ও

রক্ষণাবেক্ষণের কথা বলে। এটি এমন একটি বাস্তবতা, যা কুরআন, হাদিস ও স্বীয় মেয়েদের প্রতি রাসুলুল্লাহ -এর অনুপম আচরণ ও তত্ত্বাবধানে প্রমানিত হয়।

▫ সম্পত্তি বন্টন: নারী শব্দটি ব্যাপক অর্থবহ। এটি কেবল মেয়েকেই ধারণ করে না; বরং এর অর্থ স্ত্রী, মা, মেয়ে, বোন, নানি, দাদি, ফুফু বা খালাকেও বোঝায়। নারীরা সব সময়-ই কি ছেলেদের তুলনায় অর্ধেক সম্পত্তি পান, না কখনো সমান আবার কখনো ছেলেদের তুলনায় বেশিও পান? এখানে বেশকিছু ক্যাটাগরি রয়েছে। আমরা কেবল তাদেরই আলোচনা করতে চাই-যারা সম্পত্তি পাবেন। তাই প্রথমত এগুলোকে ৩ টি ভাগে উল্লেখ করতে চাই।:

বারো অবস্থায় নারী একজন পুরুষের চেয়ে বেশি পেয়ে থাকেন। যেমন-

[১] কোনো নারী তার স্বামী এবং একজন মেয়েসন্তান রেখে মৃত্যুবরণ করলে মেয়ে তার মায়ের সম্পদের অর্ধেক পাবে আর স্বামী পাবে এক চতুর্থাংশ।

[২] স্বামীর সাথে কোনো নারীর দুই মেয়ে থাকলে দুই মেয়ে পাবে দুই তৃতীয়াংশ আর স্বামী এক চতুর্থাংশ।

[৩] মৃত নারী যদি একাধিক ছেলেসন্তানের সাথে এক মেয়ে রেখে যান তাহলে সে ভাইদের থেকে বেশি পাবে।

[৪] যদি মৃত নারী তার স্বামী, বাবা, মা ও দুই মেয়ে রেখে যায় তবে দুই মেয়ে দুই তৃতীয়াংশ সম্পদ পাবে; কিন্তু ঠিক একই অবস্থায় যদি মেয়ের পরিবর্তে দুই ছেলে থাকত তবে তারা নিশ্চিতভাবে দুই মেয়ের তুলনায় কম পেত। কেননা, এখানে অন্যান্য ওয়ারিসদের তাদের নির্ধারিত অংশ দেওয়ার পর যা বাকি থাকে সেটুকুই হলো ছেলের অংশ। সুতরাং, স্বামী পাবে এক চতুর্থাংশ, বাবা ও মা উভয়ে পাবে এক ষষ্ঠাংশ করে এবং বাকি অংশ পাবে দুই ছেলে-যা দুই তৃতীয়াংশ তো নয়ই, বরং অর্ধেকের চেয়েও কম।

[৫] ঠিক একই ধরনের আরেকটি অবস্থা দুই সহোদর বোনের ক্ষেত্রে। যদি মৃত নারীর ওয়ারিসদের মধ্যে স্বামী, দুই সহোদর বোন/মেয়ে এবং মা থাকে তখন দুই বোন দুই তৃতীয়াংশ সম্পদ পায়; কিন্তু ঠিক একই অবস্থায় যদি দুই বোনের জায়গায় দুই ভাই থাকত তখন ওই দুই ভাই মিলে এক তৃতীয়াংশের বেশি পেত না।

[৬] তেমন একই অবস্থায় বৈমাত্রেয় দুই বোন বৈমাত্রেয় দুই ভাইয়ের চেয়ে বেশি পায়।

[৭] অনুরূপ যদি কোনো নারীর ওয়ারিসদের মধ্যে স্বামী, বাবা, মা ও মেয়ে থাকে তবে মেয়ে মূল সম্পদের অর্ধেক পাবে; কিন্তু ঠিক একই অবস্থায় ছেলে থাকলে পেত তার চেয়ে কম। যেহেতু তার প্রাপ্যাংশ হলো অংশীদারদের দেওয়ার পর অবশিষ্টাংশ।

[৮] কোনো নারীর ওয়ারিস যদি হয় স্বামী, মা ও এক সহোদর বোন তখন ওই সহোদর বোন অর্ধেক সম্পদ পাবে-যা তার স্থানে সহোদর ভাই হলে পেত না।

[৯] ওয়ারিস যদি হয় স্ত্রী, মা, বৈপিত্রেয় দুই বোন এবং দুই সহোদর ভাই তখন দূরের আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও বৈপিত্রেয় দুই বোন দুই সহোদরের চেয়ে বেশি পাবে। যেহেতু বৈপিত্রেয় বোনদ্বয় পাবে এক তৃতীয়াংশ, আর দুই সহোদর পাবে অবশিষ্টাংশ-যা এক তৃতীয়াংশের চেয়েও কম।

[১০] যদি কোনো মৃত নারীর স্বামী, বৈপিত্রেয় বোন ও দুই সহোদর ভাই থাকে সেক্ষেত্রে বৈপিত্রেয় বোন এক তৃতীয়াংশ পাবে। অথচ এই দুই সহোদর অবশিষ্টাংশ থেকে যা পাবে তা ওই বোনের এক চতুর্থাংশেরও কম।

[১১] ওয়ারিস যদি হয় বাবা, মা ও স্বামী এক্ষেত্রে ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহ আনহুর মত অনুসারে মা পাবে এক তৃতীয়াংশ, আর বাবা পাবে এক ষষ্ঠাংশ অর্থাৎ, মায়ের অর্ধেক।

[১২] স্বামী, মা, বৈপিত্রেয় বোন ও দুই সহোদর ভাই ওয়ারিস হলে এক্ষেত্রে ওই বোন দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও সহোদর ভাই দুজনের দ্বিগুণ পাবে।

দশ অবস্থায় একজন নারীর অংশ পুরুষের সমান। যেমন-

[১] ছেলের ছেলে থাকলে পিতা-মাতা সমান অংশ পাবে।

[২] বৈপিত্রেয় ভাই-বোন সব সময় সমান অংশ পায়।

[৩] বৈমাত্রেয় ভাই-বোন থাকলে সব ধরনের বোনেরা (সহোদরা, বৈপিত্রেয় ও বৈমাত্রেয়) বৈপিত্রেয় ভাইয়ের সমান পাবে।

[৪] শুধু ঔরসজাত মেয়ে ও মৃতের ভাই একসাথে থাকলে উভয়ে সমান অংশ পাবে। (মেয়ে পাবে অর্ধেক আর বাকি অর্ধেক পাবে চাচা)।

[৫] 'নানি' বাবা ও ছেলের সাথে সমান অংশ পায়।

[৬] মা ও বৈপিত্রেয় দুই বোন স্বামী ও সহোদর ভাই এর সাথে সমান অংশ পায়।

[৭] 'সহোদর বোন' স্বামীর সাথে ওয়ারিস হলে সহোদর ভাইয়ের সমান অংশ পাবে। অর্থাৎ, সহোদর বোনের পরিবর্তে সহোদর ভাই হলে যে-অংশ পেত ঠিক সহোদরাও একই অংশ পাবে। অর্থাৎ, মূল সম্পদের অর্ধেক পাবে।

[৮] বৈমাত্রেয় বোন সহোদর ভাইয়ের সমান অংশ পায় যদি মৃত ব্যক্তির স্বামী, মা. বৈপিত্রেয় এক বোন এবং একজন সহোদর ভাই থাকে। এ অবস্থায় স্বামী মূল সম্পদের অর্ধেক, মা এক ষষ্ঠাংশ, বৈপিত্রেয় ভাই এক ষষ্ঠাংশ এবং বাকি এক ষষ্ঠাংশ পাবে সহোদর ভাই।

[৯] নির্দিষ্ট অংশধারী ওয়ারিস এবং আসাবা-সূত্রে পাওয়ার মতো কেউ না থাকলে নিকটতম রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়রা সমান অংশ পাবে। যেমন: মেয়ের ছেলে, মেয়ের মেয়ে, মামা ও খালা ছাড়া অন্য কোনো ওয়ারিস না থাকলে এদের সবাই সমান অংশ পাবে।

[১০] তিন প্রকারের নারী এবং তিন প্রকারের পুরুষ কখনো সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয় না। এক্ষেত্রেও একজন নারী সমান অধিকার ভোগ করছে পুরুষের।

চার অবস্থায় নারী মিরাস পায়; কিন্তু তার সমমানের পুরুষ বঞ্চিত হয়। যেমন-

[১] ওয়ারিস যদি হয় স্বামী, বাবা, মা, মেয়ে ও নাতনি (ছেলের মেয়ে) এক্ষেত্রে নাতনী এক ষষ্ঠাংশ পাবে। অথচ একই অবস্থায় যদি নাতনির পরিবর্তে নাতি (ছেলের ছেলে) থাকত তখন এই নাতি কিছুই পেত না। যেহেতু নির্ধারিত অংশীদারদের দিয়ে অবশিষ্টাংশই তার প্রাপ্য ছিল। অথচ এ অবস্থায় কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তাই তার প্রাপ্তির খাতাও থাকে শূন্য।

[২] স্বামী, সহোদর বোন ও বৈমাত্রেয় বোন থাকা অবস্থায় বৈমাত্রেয় বোন এক ষষ্ঠাংশ পাবে। অথচ তার স্থানে যদি বৈমাত্রেয় ভাই থাকত তবে সে কিছুই পেত না, যেহেতু তার জন্য নির্ধারিত অংশ নেই।

[৩] অনেক সময় দাদি মিরাস পায়, কিন্তু দাদা বঞ্চিত হয়।

[৪] মৃত ব্যক্তির যদি শুধু নানা ও নানিই ওয়ারিস হিসেবে থাকে তখন সব সম্পত্তি পাবে নানি। নানা কোনোকিছুই পাবে না।

নারী কেবল চার অবস্থায় পুরুষের অর্ধেক পায়। যেমন-

[১] ছেলে থাকা অবস্থায় মেয়ে ও নাতি (ছেলের ছেলে) থাকা অবস্থায় নাতনি (ছেলের মেয়ে) অর্ধেক পায়।

[২] ছেলে ও স্বামী বা স্ত্রী না থাকলে 'মা' পিতার অর্ধেক পায়।
[৩] 'সহোদরা বোন' সহোদর ভাইয়ের সাথে ওয়ারিস হলে অর্ধেক পায়।
[৪] 'বৈমাত্রেয় বোন' বৈমাত্রেয় ভাইয়ের সাথে ওয়ারিস হলে।১

ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে যাদের অংশ নির্ধারিত, তাদের বলা হয় 'জাবিল ফুবুজ'। এরা নেওয়ার যদি কিছু থাকে তবে তাই যারা পায় অথবা জাবিল ফুরুজদের নেওয়ার পরে কিছুই বাকি না থাকলে যারা বঞ্চিত হয় তাদের বলা হয় 'আসাবা'। নির্ধারিত অংশ আছে ৮ জন নারীর জন্য এবং ৪ জন পুরুষের জন্য। নারী ৮ জন হলো; স্ত্রী, কন্যা, ছেলের কন্যা, সহোদর বোন, বৈমাত্রেয় বোন, বৈপিত্রীয় বোন, মা এবং দাদি/ নানি। আর পুরুষ ৪ জন হলো; পিতা, দাদা, বৈপিত্রীয় ভাই এবং স্বামী। এখানেও নারীদের আধিক্য। একেবারে দ্বিগুণ।

তাহলে আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উত্তরাধিকার-সূত্রে একজন নারী একজন পুরুষের সমান বা বেশি সম্পত্তি পেয়ে আসছে। তবে কিছু সময় তিনি অর্ধেক পাচ্ছেন।

□ স্ত্রীর হক: স্বামীর প্রতি স্ত্রী'র কিছু অধিকার রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা কুর'আন কারিমায় বলেন-

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيم.ٌ

"নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের; এবং তাদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আল্লাহ হচ্ছেন মহা পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।"[সুরা বাকারা:২২৮]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "পুরুষদের অধিকার রয়েছে স্ত্রীদের উপর, এবং স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে তোমাদের উপর।"[আত তিরমিজি:১১৫৯,সনদ সহিহ]
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবি তাকে জিজ্ঞেস করেন-

قلت يا رسول الله، مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ: أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طعم، وَأَنْ يَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَى، وَلَا يَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا يُقَبِّحُ، وَلَا يَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْت.ِ

"হে আল্লাহর রাসুল! স্ত্রীগণ আমাদের ওপর কী কী অধিকার রাখেন? উত্তরে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "তুমি যখন খাও, তখন তাকেও খাওয়াও; তুমি যখন পরিধান কর, তখন তাকেও পরিধান করাও, মুখমণ্ডলে আঘাত করো না, তাকে গালি দিও না, (প্রয়োজনে ঘরে বিছানা পৃথক করতে পার), কিন্তু একাকিনী অবস্থায় রাখবে না। "[ইবনু মাজাহ:১৮৫০;মুস্তাদরাকে হাকেম:২৭৬৪।সনদ সহিহ।]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহিস সাল্লাম বলেছেন, "ন্যায়পরায়ণরা দয়াময় আল্লাহর ডানপাশে নূরের সিংহাসনে অবস্থান করবে। তাঁর দুটি হাতই ডান। যারা ইনসাফ করে বিচারের ক্ষেত্রে, পরিবারের ব্যাপারে এবং অর্পিত দায়িত্ব পালনের সময়।"

ইবনুল আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আমি নিজেকে আমার স্ত্রীর জন্য সাজাতে পছন্দ করি, ঠিক যেভাবে আমি চাই আমার স্ত্রী আমার জন্য সাজুক।"

ইসলামে নারী নেতৃত্ব কী হারাম?

কোরআন,হাদিস ও ইজমার মাধ্যমে বিশ্লেষন :
ইসলামে নারী নেতৃত্ব; খলীফা, মন্ত্রী, বিচারক- এজাতীয় পদে তাদের আসীন করা জায়েজ নেই বরং এটা সম্পূর্ণরূপে হারাম। নিচে এ ব্যাপারে কুরআন সুন্নাহ থেকে দলিল এবং উলামাদের বক্তব্য তুলে ধরা হলো:
মহান আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা কুরআনে বলেন-
)الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِم(ْ
'পুরুষেরা নারীদের উপর কৃর্তত্বশীল এ জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে।' (সূরা নিসা:৩৪)

আল্লামা কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-
"قوله تعالى : (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) أي : يقومون بالنفقة عليهن ، والذب عنهن ، وأيضاً : فإنَّ فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو ، وليس ذلك في النساء "
আল্লাহর বাণী- (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء) "পুরুষেরা নারীদের উপর কৃর্তত্বশীল" অর্থাৎ পুরুষেরা নারীদের ভরণপোষণ বহন করবে, তাদের রক্ষা করবে। শাসক, বিচারক ও যোদ্ধা ও তাদের থেকেই হবে; নারীদের থেকে নয়।(তাফসীরে কুরতুবী: ৫/১৬৮)

সূরা আহযাবে আল্লাহ তাআলা একজন নারীর কাজকর্মের গন্ডিসীমা পরিষ্কার ভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। এরশাদ হচ্ছে-

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى
'তোমরা তোমাদের নিজ নিজ ঘরে আবদ্ধ হয়ে থাকো এবং পূর্বের জাহেলী যুগের প্রদর্শনের ন্যয় নিজদেরকে প্রদর্শন করে বেড়িও না'।
[সূরা আযহাবঃ ৩৩]

এ আয়াতে পরিষ্কার করে বলে দেয়া হয়েছে যে, নারী জাতির আসল দায়িত্ব হল গৃহের দায়িত্ব। তার কর্তব্য হল, গৃহের বাহিরের কষ্ট পরিশ্রম ও সংগ্রাম থেকে নিজকে গুটিয়ে

নিয়ে নিজ গৃহের সংশোধন এবং পরিবারের তরবিয়ত প্রতিপালন-পরিচর্যার মত ফরয কাজটিকে আনজাম দেয়া, যা মূলতঃ গোটা জাতি ও জীবন সংসারের বুনিয়াদ।

কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেছেন-
(لن يفلح قوم ولَّوا أمرَهم امرأة)
"ঐ জাতি কখনই সফল হতে পারবে না যারা নারীকে তাদের কর্তৃত্বশীল/ শাসক হিসেবে নির্ধারণ করে।" (সহীহ বুখারী: ৪১৬৩)
অনুরূপভাবে বিচারপতির পদ।''
(তাফসির ইবনে কাসির: ১/৪৯২)

হাদিসে রয়েছে-
عن أبي بكرة رضي الله عنه قال : لما بلغ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملَّكوا عليهم بنت كسرى ، قال : (لن يُفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة (

আবূ বকরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি কথা দিয়ে আল্লাহ্ জঙ্গে জামাল (উষ্ট্রের যুদ্ধ) এর সময় আমাকে বড়ই উপকৃত করেছেন।
(তা হল) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট যখন এ খবর পৌঁছল যে, পারস্যের লোকেরা কিসরার মেয়েকে তাদের শাসক নিযুক্ত করেছে, তখন তিনি বললেনঃ সে জাতি কক্ষনো সফলকাম হবে না, যারা তাদের শাসনভার কোন স্ত্রীলোকের হাতে অর্পণ করে
(সহীহ বুখারী:৭০৯৯,৪৪২৫; আধুনিক প্রকাশনী- ৬৬০৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬৬১৮)

(২) হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রাসুলে করীম ﷺ এরশাদ করেন-
اذا كانت امراءكم خياركم و اغنياءكم سمحاءكم و اموركم شورى بينكم فظهر الارض خيرلكم من بطنها و اذا كانت امراءكم شراركم و اغنياءكم بخلاءكم و اموركم الى نساءكم فبطن الارض خيرلكم من ظهرها –
'যখন তোমাদের উৎকৃষ্ট লোকগুলি তোমাদের আমীর (প্রশাসক) হবে, তোমাদের ধনী লোকগুলি তোমাদের দানশীলরাই হবে এবং তোমাদের বিষয়আশয়গুলি তোমাদের মাঝে পরামর্শের মাধ্যমে সম্পাদিত হবে, তখন জমিনের উপরিভাগ তোমাদের জন্য

জমিনের গহবর থেকে উত্তম হবে। আর যখন তোমাদের নিকৃষ্ট লোকগুলি তোমাদের আমীর (প্রশাসক) হবে, তোমাদের ধনী লোকগুলি তোমাদের কৃপণরাই হবে এবং তোমাদের বিষয়আশয়গুলি তোমাদের নারীদের হাতে সোপর্দ করা হবে, তখন জমিনের গহবর তোমাদের জন্য জমিনের উপরিভাগের চেয়ে উত্তম হবে'। [জামে তিরমিযী- ২/৪২]

এই হাদীসটি এতই পরিষ্কার যে, এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষনের কোনো প্রয়োজন নেই।
উল্লেখিত হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয়, নারী নেতৃত্ব হারাম এবং কোনো সম্প্রদায় নারীকে নেত্রী বানায় তাহলে তারা কখনো সফল হবে না।

হযরত আবু বকরাহ রা. বর্ণনা করেন,

রাসুলে করীম ﷺ একবার কোথাও সৈন্যদল প্রেরন করলেন। সেখান থেকে এক ব্যক্তি বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে এলে বিজয়ের সুসংবাদ শুনে তিনি সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। সিজদা'র পর তিনি সংবাদ বাহকের কাছ থেকে বিস্তারিত বিবরণ শুনছিলেন। সংবাদদাতা বিস্তারিত বর্ণনা দান করলেন- فكان فيما حدثه من امرا العدو و كانت تليهم امراة , فقال النبى صلى الله عليه وسلم هلكت الرجل حين اطاعت النساء –

'উক্ত বিবরণে শত্রুদের ঘটনাবলীর মধ্যে একটি বিষয় এও ছিল যে, একজন নারী তাদের নেতৃত্ব করছিল। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) একথা শুনে বললেন- هلكت الرجل حين اطاعت النساء 'পুরুষরা যখন নারীদের অনুগত্য করা শুরু করে দিবে, তখন তারা বরবাদ-ধ্বংস হয়ে যাবে'। [মুসতাদরাকে হাকীম- ৪/২৯১, হাদিস ৭৮৭০]

পবিত্র কুরআনে সূরা আহযাবে নারীদের যে গন্ডিসীমার বর্ণনা দেয়া হয়েছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ একটি হাদিসে তার 'সমর্থিত ব্যাখ্যা' দিয়েছেন এভাবে-

و المراة راعية على اهل بيت زوجها و ولده و هى مسئلة عنهم

'একজন নারী হল তার স্বামীর 'গৃহবাসী ও তার সন্তান-সন্ততির' রক্ষনাবেক্ষনকারী। (এটাই তার জিম্মাদারী ও দায়িত্ব)। সে তাদের ব্যপারে জিজ্ঞাসীত হবে।' [সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১৩৮, ৮৯৩]

এই হাদীসে পরিষ্কার করে বলে দেয়া হয়েছে যে, নারীদের দায়িত্ব হল বাড়ির ব্যবস্থাপনার দেখভাল্ করা, সন্তান-সন্ততির তরবিয়ত ও পরিচর্যা করা এবং ব্যক্তিগত ব্যপার-স্যপারগুলোর সুবন্দোবস্থ করা। গৃহের বহিঃর্ভাগের কোনো দায়দায়িত্ব তার কাধে সোপর্দ করা হয় নি।

শারহুস্ সুন্নাহ্ গ্রন্থে এসেছে যে,
নারীর জন্য ইমাম, কাযী হওয়া বৈধ নয়। কেননা ইমাম ও বিচারপতির জন্য মুসলিমদের সকল বিষয় দেখাশোনা করার জন্য বের হওয়ার প্রয়োজন। আর মহিলা সর্বদা পর্দাতে থাকবে। সুতরাং তাদের জন্য এটা বৈধ নয়। আরো কারণ হলো, মহিলারা অল্প জ্ঞানের অধিকারী। আর বিচার ফায়সালা করা রাষ্ট্রের একটি পূর্ণাঙ্গ কাজ। এটা মহিলাদের জন্য ঠিক নয় তবে জ্ঞানবান পুরুষের জন্য তা বৈধ।
(ফাতহুল বারী ৮ম খন্ড, হাঃ ৪৪২৫; তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খন্ড, হাঃ ২২৬২)

ইমাম শওকানী রাহিমাহুল্লাহ উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন-
"فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات ، ولا يحل لقوم توليتها ، لأنه يجب عليهم اجتناب ما يوقعهم في عدم الفلاح"
"হাদিসের দলিল রয়েছে মর্মে যে নারীরা শাসক হওয়ার জন্য উপযুক্ত নয় কোন কর্মের জন্য তাদেরকে শাসক হিসেবে নিযুক্ত করা বৈধ নয় কেননা এটা তাদের বিফল হওয়াকে অবধারিত করে।" (নাইলুল আওতার: ৮/৩০৫)

⊛আল্লামা মাওয়ার্দী রাহিমাহুল্লাহ বলেন"
"কোন নারীর জন্য শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়া বৈধ নয়। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-
'সে জাতি কক্ষনো সফলকাম হবে না, যারা তাদের শাসনভার কোন স্ত্রীলোকের হাতে অর্পণ করে।'
এর আরো কারণ হলো শাসনকার্য পরিচালনা অন্যের মতামত চাইতে হয় এবং দৃঢ় প্রত্যয়ী হতে হয় আর এই ব্যাপারে নারীরা দুর্বল। শাসকের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য প্রকাশ্যে গমনাগমন করতে হয় যা তাদের জন্য নিষিদ্ধ।" (আল আহকামুস সুলতানিয়্যাহ: ৪৬)

ফিকহ বিশ্বকোষে রয়েছে"
এই ব্যাপারে সমস্ত ফকীহ একমত যে, প্রধান শাসক হওয়ার জন্য শর্ত হলো পুরুষ হওয়া। কাজেই নারীর নেতৃত্ব শুদ্ধ হবে না। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-
'সে জাতি কক্ষনো সফলকাম হবে না, যারা তাদের শাসনভার কোন স্ত্রীলোকের হাতে অর্পণ করে।'
(নেতৃত্ব নারীকে দেওয়া হয়নি বরং পুরুষকে দেওয়া হয়েছে) যাতে তারা পুরুষদের সাথে মিশতে পারে, শাসনকার্য পরিচালনার জন্য নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে। উপরন্তু এটা এক পদ যেখানে গুরুতর ও ভারী দায়িত্ব রয়েছে যা কেবল পুরুষদের জন্যই মানানসই।" (আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ: ২১/২৭০)

সৌদি আরবের প্রাক্তন গ্রান্ড মুফতি শাইখ বিন বায রাহিমাহুল্লাহ বলেন"
"নারী নেতৃত্ব জায়েজ নেই। এই ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার দলিল রয়েছে। কুরআনের দলীল হলো, মহান আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা কুরআনে বলেন
'পুরুষেরা নারীদের উপর কৃর্তত্বশীল এ জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে।' (সূরা নিসা:৩৪)
পরিবারে পুরুষের শাসন ক্ষমতার ব্যাপারে আয়াতের বিধানটি সাধারণ। কাজেই অন্যান্য নেতৃত্বের ব্যাপারে ও আয়াতটি অধিকতর বেশি যৌক্তিকভাবে প্রযোজ্য হবে। বিষয়টি আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে আয়াতে কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। আর সেটা হলো পুরুষের মতামত ও বুদ্ধিমত্তার শ্রেষ্ঠত্ব; যা বিচার ফয়সালা ও নেতৃত্বের জন্য বড় সহায়ক।
সুন্নাহ থেকে দলিল হলো- পারসিকরা সম্রাটের মেয়েকে তাদের নেত্রী হিসেবে গ্রহণ করে, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-
(لن يفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة) ، رواه البخاري.
'সে জাতি কক্ষনো সফলকাম হবে না, যারা তাদের শাসনভার কোন স্ত্রীলোকের হাতে অর্পণ করে।' (সহীহ বুখারী)
নিঃসন্দেহে অত্র হাদীসটি ব্যাপকভাবে অথবা কোন শহরে অথবা কোন অঞ্চলের নারী নেতৃত্ব হারাম হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলিল। সাধারণ হুকুমের দাবী এমনটাই। রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফলতা নাকচ করে দিয়েছেন, যারা নারীকে নেতৃত্ব দেয়। আর সফলতা হল বিজয়, কল্যাণ লাভ বুঝায়।
বুদ্ধিবৃত্তিক দাবিও এটাই যে, সাধারণ নেতৃত্ব তাদের না দেওয়া। কেননা নেতৃত্বের জন্য মনোনীত ব্যক্তিকে জ্ঞানগত কামালিয়াত, দৃঢ়তা, বিচক্ষণতা, ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা, উত্তম পরিচালনা প্রভৃতি গুণ থাকা বাঞ্ছনীয়।
আর এসব বৈশিষ্ট্য নারী প্রকৃতির সাথে বেমানান। কেননা তারা সৃষ্টিগতভাবে জ্ঞানগত কমতি, চিন্তাশক্তিতে দুর্বল। উপরন্তু তারা ভীষণভাবে আবেগপ্রবণ। কাজেই মুসলিম কল্যাণ, সম্মান লাভ প্রভৃতি বিবেচনায় এই পদ তাদের জন্য মানানসই নয়।" (আল মুজতামা' সাময়িকী, সংখ্যা: ৮৯০)

ইমাম ইবনে হাযাম রহ. (মৃঃ ৪৫৬ হিঃ) مراتب الاجماع নামে একটি কিতাব লিখেছেন; যে সব মাসআলার উপর উম্মাহ'র ইজমা (ঐক্যমত) রয়েছে- তিনি সেগুলোকে সেখানে সন্নিবেশিত করে দিয়েছেন। তিনি সেই কিতাবে লিখিছেন- و اتفقوا ان الامامة لا تجوز لامراة –'সকল ওলামায়ে কেরাম এব্যপারে একমত যে, কোনো নারীর জন্য 'রাষ্ট্র প্রধান' হওয়া জায়েয নয়'। [মারাতিবুল ইজমা, ইবনে হাযাম- ১২৬ পৃষ্ঠা]

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহঃ (মৃঃ ৭২৮ হিঃ)-এর ন্যয় বিজ্ঞ আলেম আল্লামা ইবনে হাযাম রহ.-এর উল্লেখিত কিতাবের উপর نقد مراتب الجماع নামক একটি সমালোচনামূলক কিতাব রচনা করেছেন এবং তাতে এমন কিছু মাসআলার উল্লেখ করেছেন, যেগুলোকে আল্লামা ইবনে হাযাম 'ইজমা' বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ'র গবেষনা ও তাহক্বীক্ব মতে ওগুলো ইজমা নয়। বরং ওগুলোর ব্যপারে কারো না কারো মতভিন্নতা রয়েছে। সেই কিতাবেও ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. নারী নেতৃত্বের পশ্নে আল্লামা ইবনে হাযামের কোনো বিরোধীতা করেন নি। [দেখুন: নাক্বদু মারাতিবিল ইজমা, ইবনে তাইমিয়্যাহ- ১২৬ পৃষ্ঠা]

এসকল হযরতগন ছাড়াও যে সকল উলামা, ফুকাহা এবং ইসলামী রাজনীতি বিশেষজ্ঞমন্ডলী 'ইসলামী রাজনৈতিক' ব্যবস্থার উপর গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকেই এই মাসআলাটিকে একটি সর্বসম্মত মাসআলা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

⊛ইমাম কুরতুবী রহঃ এই ব্যপারে ইজমা রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন যে, “নারী নেতৃত্ব বৈধ নয়।” [আহকামুল কুরআনে]

⊛আল্লামা শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) তার হুজ্জাতুল বালিগাহ তে বলেছেন, “নারী নেতৃত্ব বৈধ নয়। নেতৃত্ব হওয়ার জন্য তাকে অবশ্যই পুরুষ হতে হবে।”

⊛ইমাম ইবনে কাসীর রহঃ বলেন,
“নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য পুরুষ হওয়া ফরয।”

⊛হানাফী আলেম, মোল্লা আলী কারী (রহঃ) ফায়যুল বারীতে লিখেছেন যে, “নারী নেতৃত্ব জায়েযনয়।”

⊛ইমাম আবুল হাসান মাওয়ারদী রহঃ (মৃঃ ৪৫৬ হিঃ)-এর গ্রন্থকে ‘ইসলামী রাজনীতি’র একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্- গ্রন্থ বলে মনে করা হয়ে থাকে। সেখানে তিনি ‘রাষ্ট্রীয় নের্তৃত’ তো পরের কথা, নারীর উপর (সাধারণ) মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব পর্যন্ত সোপর্দ করাকে নাজায়েয বলে অবিহিত করেছেন। বরং তিনি মন্ত্রীত্বকে দু’ভাগে বিভক্ত করেছেন। একটি হল وزارت تفويض (ওযারাতে তাফুউইজ); এই মন্ত্রী ব্যবস্থায় (রাষ্ট্রীয়) ‘পলিসী/নীতিমালা’ নির্ধারন করাও মন্ত্রীর কাজের অন্তর্ভূক্ত হয়ে থাকে। দ্বিতীয়টি হল وزارت تنفيذ (ওযারাতে তানফিজ); এরকম মন্ত্রী কোনো পলিসী তৈরী করে না, বরং পূর্ব নির্ধারিত পলিসীকে কার্যকর করে। ইমাম মাওয়ারদী বলেছেন যে, ‘ওযারাতে তানফিজ’-এর মধ্যে মন্ত্রীত্বের শর্ত শরায়েত ‘ওযারাতে তাফুউইজ’ এর তুলনায় কম বা হালকা। এতদ্বসত্ত্বেও তিনি ‘ওযারাতে তানফিজ’-এর দায়িত্ব কোনো নারীর হাতে সোর্পদ করাকেও জায়েয বলেন নি। তিনি লিখেছেন-
‘ওযারাতে তানফিজ’ সম্পর্কে কথা হল, এর বিধিবিধানগুলো (ওযারাতে তাফুউইজ থেকে) তুলনামূলক হালকা এবং এর শর্তশরায়েতও অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু কোনো নারীর জন্য এ দায়িত্ব গ্রহন করাও জায়েয নয়-চাই সেই নারীর অবস্থা যত গ্রহনযোগ্যই হোক না কেনো। কেননা, এ ধরনের মন্ত্রীত্বও এমন এক অভিভাবকত্ব্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগিত হয়, যে অভিভাবকত্ব্যকে (শরীয়ত) নারী জাতি থেকে পৃথক রেখেছে। কেননা, রাসুলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে- যে জাতী তাদের বিষয়আসয়গুলোকে কোনো

নারীর উপর সোপর্দ করে দেয়, তারা সফলকাম হতে পারবে না। তদুপরি এজন্যেও যে, এধরনের মন্ত্রীত্বের জন্য যে পরিপক্ক সিদ্ধান্ধ ও সুদৃঢ় অবিচলতা দরকার, তা নারী জাতির মধ্যে দূর্বলমাত্রায় পাওয়া যায়। তাছাড়া এ ধরনের মন্ত্রীত্বের ফরয দায়িত্ব আনজাম দেয়ার জন্য তাকে সর্বসাধারণ জনতার সামনে প্রকাশ্যে এমনভাবে আসতে হয়, যা নারীদের জন্য শরয়ীভাবে নিষিদ্ধ’। [আল আহকামুস সুলতানীয়্যাহ, মাওয়ারদী- ২/৭২৫]

⧆ইমামুল হারামাঈনই তাঁর আরেক কিতাব الارشاد فى اصول الاعتقاد -এ লিখেছেন-

و اجمعوا ان المراة لا يجوزان تكون اماما و ان اختلفوا فى جواز كونها قاضية فيما يجوز شهادتها فيه

‘আর এব্যপারে সকলেই একমত যে, নারীকে ‘রাষ্ট্র প্রধান’ বানানো জায়েয নয়। অবশ্য যে সব ক্ষেত্রে কোনো নারী সাক্ষ্য দান করতে পারবে, সেসব ক্ষেত্রে সে কাজী (বিচারক) হতে পারবে কি না -সে ব্যপারে মতভিন্নতা রয়েছে’। [আল ইরশাদ ফি উসূলীল ই’তিক্বাদ, ইমামুল হারামাঈন- ৩৫৯, ৪২৭ পৃষ্ঠা]

⧆আল্লামা ক্বালকাশানদীকে সাহিত্য রচনা এবং ইতিহাস ও রাজনীতির ইমাম মনে করা হয়ে থাকে। তিনি ইসলামের রাজনৈতিক উসূলসমৃদ্ধ যে গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাতে রাষ্ট্র প্রধানের চোদ্দটি যোগ্যতা গুণের কথা তিনি ব্যক্ত করেছেন। শর্তগুলোর একেবারে প্রথমেই তিনি লিখেছেন- 'প্রথম শর্ত হলঃ তাকে পুরুষ হতে হবে। এ বিধানের পিছনে হেকমত এই যে, একজন রাষ্ট্র প্রধানের পক্ষে পুরুষদের সাথে মেলামেশা করা এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করা থেকে নির্লিপ্ত থাকা সম্ভবই নয়। অথচ একজন নারীর জন্য তা নিষিদ্ধ। এছাডাও একজন নারী তার নিজের অভিভাবকত্বের প্রশ্নেও দূর্বল; এমনকি সে বিয়ের অবিভাবকও হতে পারে না। সুতরাং তাকে অন্যদের উপরও অবিভাবক বানানো যেতে পারে না'। [মাআছিরুল ইনাফা ফি মাআলেমিল খিলাফহ, ক্বালকাশানদী- ১/৩২]

* ইমাম বগভী রহ. (মৃঃ ৫১৬ হিঃ) হলেন পাঁচ'শত হিজরীর একজন সুবিখ্যাত মুফাসুসীর, মুহাদ্দিস এবং ফিকাহ শ্বাস্ত্রবীদ। তিনি বলেছেন-

'মুসলীম উম্মাহ এ ব্যপারে একমত যে, নারীর জন্য 'রাষ্ট্র প্রধান' হওয়া জায়েয নয়। কেননা 'রাষ্ট্র প্রধান'-কে জীহাদ সংশ্লিষ্ট বিষয় এবং মুসলমানদের বিভিন্ন ব্যপারগুলোকে আনজাম দেওয়ার জন্য বাহিরে বেড় হওয়ার মুকাপেক্ষি হয়ে পড়তে হয়। ..... অথচ নারী হল গোপন থাকার বস্তু। সর্বসাধারণের সমাবেশে আসা তার জন্য জায়েয নেই'। [শারহুস সুন্নাহ, বগভী- ১০/৭৭]

* ইমাম আবু বকর ইবনুল আরাবী রহ. হযরত আবু বকরাহ রা.-এর হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন-

و هذا نص في ان المراة لا تكون خليفة و لا خلاف فيه

'হাদীসটি এ কথারই দলিল যে, নারী খলীফা (রাষ্ট্র প্রধান) হতে পারবে না। এ ব্যপারে কোনোই দ্বিমত নেই। [আহকামুল কুরআন, ইবনুল আরাবী- ৩/৪৪৫]

* ইমাম কুরতুবীও তার তাফসীর গ্রন্থে ইবনুল আরাবীর উপরোক্ত মন্তব্যটি উল্লেখ করে তার সমর্থন করেছেন এবং বলেছেন, এ মাসআলা সম্পর্কে আলেমগনের মাঝে কোনোই মতদ্বন্দ্ব নেই। [তাফসীরে কুরতুবী- ১৩/১৮৩; সূরা নামল]

* ইমাম গাযালী রহ. বলেছেন

'রাষ্ট্র প্রধান হওয়ার চতুর্থ শর্ত হল- পুরুষ হওয়া। সুতরাং কোনো নারীর নেতৃত্ব গ্রহনযোগ্য নয়- চাই সে যাবতীয় গুণে গুণান্বিতই হোক এবং ধৈর্য-বীর্যের সমস্ত গুণই তার মধ্যে থাকুক না কেনো। [ফাজাইহুল বাতিনিয়্যাহ, গাযালী- ১৮০ পৃষ্ঠা]

আকাঈদ ও কালাম শ্বাস্ত্রের সম্ভাব্য সমস্ত কিতাবেই রাষ্ট্র প্রধানত্বতা এবং ইসলামী রাজনীতির বিধিবিধান সম্পর্কিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে। তাদের সকলেই 'পুরুষ' হওয়ার শর্তটিকে একটি 'ইজমায়ী' (ঐক্যমতে উপনীত) শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

* আল্লামা তাফতাযানী রহ. লিখেছেন –

يشترط في الامام ان يكون مكلفا حرا ذكرا عدلا

'রাষ্ট্র প্রধান হওয়ার জন্য শর্তগুলো হলঃ আকেল ও বালেগ হওয়া, স্বাধীন হওয়া, পুরুষ হওয়া এবং ন্যায়পরায়ন হওয়া'। [শারহুল মাকাসিদ-২/৭৭]

ফুকাহা, মুহাদ্দিসীন এবং ইসলামী রাজনীতির উলামায়ে কেরামের এই যৎসামান্য উদ্ধৃতিগুলি নিছুক নমুনা স্বরূপ পেশ করা হল। নচেৎ যে কিতাবেই ইসলামে 'রাষ্ট্র প্রধান' হওয়ার শর্তসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে 'পুরুষ' হওয়াকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি কেউ এই শর্তটিকে উল্লেখ না করে থাকেন, তাহলে সেটা এ জন্যেই করেছেন যে, এ শর্তটিও 'আকেল ও বালেগ' হওয়ার শর্তের মত এতই প্রসিদ্ধ ও পরিজ্ঞাত একটি শর্ত যে, সেটাকে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে উল্লেখ করারও প্রয়োজন বোধ করা হয়নি। অন্যথায়, এ মাসআলা নিয়ে কোনোই মতদ্বন্দ্ব নেই।

ইসলামে 'রাষ্ট্রীয় ইমামত (নেতৃত্ব)' এবং 'নামাযের ইমামতীর দায়িত্ব'-এদুটো বিষয় এতই অতঃপ্রত ভাবে জড়িত যে

'রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব'-কেও শরীয়তের পরিভাষায় امامت)ইমামত)-ই বলা হয়ে থাকে। আর امام)ইমাম) কথাটি যেমনিভাবে নামায পড়ানেওয়ালাকে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়, তেমনিভাবে 'রাষ্ট্রপ্রধান'-কেও 'ইমাম' বলা হয়ে থাকে। কুরআন হাদীসের বহু স্থানে 'রাষ্ট্রপ্রধান'কে 'ইমাম' শব্দ দ্বারা অবিহিত করা হয়েছে। আর ফিকাহবীদ আলেমগণ 'ইমামত'-এর এই দ্বিবিধ অর্থকে এভাবে পার্থক্য করেন যে, নামাজের 'ইমামতী' কে তারা امامت صغری)ইমামত-ই-সুগরা বা ছোট ইমামত) এবং রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বকে امامت کبری (ইমামত-ই কুবরা বা বড় ইমামত) বলে থাকেন।

তদুপরি এই প্রমাণপুষ্ট কথাটিকেও কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে, নামাযের মধ্যে কোনো নারীই কোনো পুরুষের ইমামতী করতে পারবে না। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত যখন

ছোট স্তরের ইমামতীর দায়িত্বই নারীর উপর ন্যস্ত করেন নি, তখন তার কাঁধে বড় স্তরের ইমামতী কি করে সোপর্দ করা যেতে পারে?

ইসলামে 'রাষ্ট্রীয় ইমামত বা নেতৃতে'র সাথে নামাযের যে কি পরিমাণ গভীর সম্পর্ক রয়েছে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় দিয়েই তার অনুমান করা যেতে পারে-

(ক) পৃথিবীর কোনো অংশে ইসলামের হুকুমত ও কর্তৃত্ব অর্জিত হওয়ার পর(اقامت صلوة)নামায কায়েম করা)-কে 'আমীরুল মু'মিনীন (মুসলীম রাষ্ট্র প্রধান)'-এর সর্বপ্রথম ফরয দায়িত্ব বলে অবিহিত করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ-

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ

'এরা ওই সমস্ত লোক, আমি যদি তাদেরকে ভূ-পৃষ্ঠে কর্তৃত্ব দান করি, তাহলে তারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, নেক্ কাজের নির্দেশ দেয় এবং মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে"। [সূরা হজ্জ ৪১]

(খ) রাসুলে করীম থেকে নিয়ে খুলাফায়ে রাশেদীন পর্যন্ত, বরং এর পরবর্তী কয়েক যুগ পর্যন্ত 'মুতাওয়াতির' এই আমলটি অব্যহতভাবে চলে আসছে যে, যে জনগোষ্ঠির মধ্যে 'রাষ্ট্র প্রধান' (তথা আমিরুল মু'মিনীন) বিদ্যমান ছিলেন, তিনিই সেই জনগোষ্ঠির ইমামতী করতেন। আর গবেষক ফুকাহায়ে কেরামগণও এ ব্যপারে একমত যে, নামাজের ইমামতীর দায়িত্ব সবার আগে মুসলীম 'রাষ্ট্র প্রধানে'র অধিকারেই বর্তায়। রাসুলে করীম মৃত্যুর পূর্বে রোগের কারণে যখন মসজীদে আসতে অপারগ হয়ে পড়লেন, তখন তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.-কে তাঁর স্থলে নামাযের জন্য নিয়োগ দিয়েছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম রা. এ থেকে একথাই বুঝে নিয়েছিলেন যে, হযরত আবু বকরের কাঁধে ছোট ইমামতের দায়িত্ব ন্যস্ত করার পিছনে এ দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে যে, রাসুলে করীম-এর পর 'বড় ইমামত' তথা রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও সর্বাধিক উপযুক্ত ব্যক্তি হচ্ছেন হযরত আবু বকর রা.। লোকদের মাঝে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. কেই রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব্যের সবচাইতে বেশি হক্কদার বলে মনে করি। তিনি নবীজীর 'গুহা-সাথী', 'দুজনের একজন'। আমরা তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে জানি।

রাসুলুল্লাহ জীবিত থাকতেই লোকদের নামাযে তাঁকে ইমামতী করার নির্দেশ দিয়েছেলেন। [মুসতারাকে হাকীম- ৩/৬৬]

(গ) নামাযের মধ্যে 'আমিরুল-মু'মিনীনে'র ইমামতীর অধিকারটি শরীয়তে এত অধিক গুরুত্ব রাখে যে, 'জানাযা নামাযে'র ইমামতীর ক্ষেত্রে 'আমিরুল-মু'মিনীন'-কে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারদের উপরেও স্থান দেয়া হয়েছে। আর একথাও প্রমাণিত যে, 'আমিরুল-মু'মিনীন' যদি জানাযার নামাযে উপস্থিত থাকেন, তাহলে ইমামতীর সর্ব প্রথম হক্ক তাঁর; এর পরে উত্তরাধিকারদের।

এসব বিধান থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ইসলামে 'রাষ্ট্রীয় নেতৃতে'র সাথে নামাযের ইমামতীর এতই গভীর সম্পর্ক রয়েছে যে, ইসলামে এমন কোনো 'রাষ্ট্র প্রধানের' কথা কল্পনাও করা যায় না, যিনি কোনো অবস্থাতেই নামাযের ইমামতী করার উপযুক্ত নন। কোনো নারী তাকওয়া-পরহেজগারী ও পবিত্রতার প্রশ্নে যত উচ্চ মাকামের অধিকারিই হোন না কেনো, যেহেতু তিনি নামাযে পুরুষের ইমামতী করতে পারেন না, তাই তার উপর 'বড় ইমামত' (তথা রাষ্ট্র প্রধানত্ব)-এর দায়িত্বও সোপর্দ করা যেতে পারে না।

ইসলামের সমস্ত বিধিবিধানের ক্ষেত্রে মোটের উপর যে বিষয়টি পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হয় তা এই যে, নারীকে এমন লাবনীয় ও আকর্ষনীয় পাত্র হিসেবে অবিহিত করা হয়েছে, যাকে কোনো প্রয়োজন ছাড়া মানুষের সাধারণ সমাবেশে আসাকে কোনো অবস্থাতেই পছন্দ করা হয় নি। নবীয়ে المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها - A - الشيطان - 'নারী হচ্ছে গোপনীয় থাকার পাত্র। সে যখন বাহিরে বেড় হয়, তখন শয়তান তার পশ্চাদানুসরণে লেগে যায়।' [জামে তিরমিযী, হাদীস ১১৮৩]

একারণেই নারীকে পর্দা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং সাধারণ মুসলমানদেরকে এই তাগিদ দেয়া হয়েছে যে-

وإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

'আর তোমরা যখন তাদের কাছ থেকে কিছু চাইবে, তখন পর্দার পিছন থেকে চেয়ে নাও'। [সূরা আহযাব ৫৩]

১. নারীর উপর জুমআর নামায ওয়াজিব নয়।
২. নারীর জন্য মাহরাম ছাড়া সফর করা জায়েয নয়।
৩. নারীর জন্য একাকি অবস্থায় হজ্জ আদায় করা ফরয নয়। মৃত্যু পর্যন্ত 'মাহরাম' পাওয়া না গেলে সে বদলী হজ্জের ওসিয়ত করে যাবে।
৪. নারীর উপর জীহাদ ফরজ নয়।
৫. নারীর জন্য জামাআতের সাথে নামায পড়া ওয়াজিব নয়।
৬. নারীর জন্য ঘরে একাকি নামায পড়া বাইরে জামাআতের সাথে নামায পড়া হতে অধিক ফজীলতপূর্ণ।

এখন ভেবে দেখার বিষয়, যে 'দ্বীন ইসলাম' নারীর পবিত্রতা এবং তার ইজ্জত আব্রু হিফাজতের উদ্দেশ্যে স্থানে স্থানে এত গুরুত্ব দিয়েছে যে, দ্বীনের বড় বড় 'আরকান' ও 'শিয়ার'-কেও তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে, সেই দ্বীন সম্পর্কে একথা কি করে চিন্তা করা যেতে পারে যে, দেশ ও জাতির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নারীর কাঁধে সোপর্দ করে সে তাকে রাষ্ট্রের সামনেই শুধু নয় বরং গোটা পৃথিবীর সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিবে !!! আর সংঘবদ্ধভাবে করার জন্য তার কাঁধে ওই সমস্ত কাজ কারবার ন্যস্ত করবে, যেসব কাজের দায়িত্ব তার উপর ব্যক্তি পর্যায়গতভাবেও আরোপিত হয় না!!!

দু'জাহানের সর্দার রাসুলে করীম-এর যুগ থেকে নিয়ে খুলাফায়ে রাশেদাহ বরং 'খুলাফায়ে রাশেদাহ'র পরেও কয়েক যুগ পর্যন্ত 'খলীফা' ও 'রাষ্ট্রপ্রধান' নির্বাচন বিষয়টি উম্মাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অঙ্গোন পরিগ্রহ করেছে। এক খলীফার পর অন্য খলীফা নির্বাচনের সময় প্রত্যেক ক্ষেত্রে বহু মতামত সামনে এসেছে। সে যুগে এমন অসংখ্য নারী বিদ্যমান ছিলেন, যারা তাদের ইলম, ফজল, পবিত্রতা, পরহেজগারী ও বিবেক-বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে অনন্য পর্যায়ের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু কোনো নারীকে যে কখনই রাষ্ট্র প্রধান বানানো হয়নি- ব্যপার শুধু তাই নয়, বরং তখন নিম্ন স্তরের এমন কোনো মতামতও সামনে আসেনি যে, অমুক নারীকে 'খলীফা' বানানো হোক। এটা একথারই সুস্পষ্ট দলিল যে, এ ব্যপারে কুরআন-সুন্নাহ'র আহকাম এতটাই

পরিষ্কার ছিল যে, কখনো কোনো মুসলমানের অন্তরে নারীকে 'খলীফা' বানানোর সামান্য খেয়ালটুকু পর্যন্ত আসেনি। আর আসবেই-বা কেমন করে, যখন ইসলামে এমন কোনো পুরুষের কথা চিন্তাই করা যায় না কেউ কেউ নারী নেতৃত্বের বৈধতা প্রমাণ করতে গিয়ে ইতিহাসের কিছু উদাহরণ পেশ করে থাকেন যে, অমুক অমুক স্থানে অমুক নারী 'রাষ্ট্রপ্রধান' হিসেবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু বলাবাহুল্য, জায়েয নাজায়েয সব রকম ঘটনাই ইতিহাসে ঘটেছে। দ্বীন ইসলামে ওসব ঘটনা কোনো দলিলই নয়। দলিল হল কুরআন ও সুন্নাহ। কাজেই কোথাও যদি নারী নেতৃত্বের ছিটে-ফোটা কিছু ঘটনা ঘটে থাকেও, তবুও সেসব ঘটনার উপর ভিত্তি করে
কুরআন-সুন্নাহ'র সুস্পষ্ট বিধান ও দলিলসমূহকে পরিত্যাগ করা যেতে পারে না। তদুপরি ওসব ছিটে-ফোটা ঘটনাগুলোর অধিকাংশই এমন যে, মুসলমান সমাজ ওরকম সরকারকে আমলেই নেয়নি। এমন কি এক সময় সেই সরকার খতম হয়ে গেছে। তাছাড়া ওসব সরকারের আমলগুলোতেও এমন কোনো ঘটনার কথা পাওয়া যায় না যে, কোনো আলেম বা ফকীহ্ নারী-নেতৃত্বকে জায়েয বলে ফাতওয়া দিয়েছেন।

নারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

পুরুষদের যেমন দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, নারীদেরও কিছু দায়িত্ব রয়েছে

▢ স্বামীর প্রতি অনুগত্য :ইসলাম নারীদের যেমন অধিকার প্রদান করেছে, তেমনি তাদের উপর কিছু বাধ্যবাধকতাও অর্পণ করেছে। এদের মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে একজন নারীর উপর তার স্বামীর অধিকার। একজন নারীর স্বামীই তার জান্নাত কিংবা জাহান্নাম। অর্থাৎ সে যদি তাকে মান্য করে, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আবার কেউ যদি তার স্বামীর অবাধ্যতা করে, তবে সে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। নীচে বর্ণিত হাদিসগুলো একজন নারীকে তার স্বামীর আনুগত্য করার ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করেছে। রাসুলুল্লাহ বলেন-

الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَأَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَت.ْ

"যখন একজন নারী নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, রামাদানে রোযা রাখে, নিজের সতীত্ব ও পর্দার হেফাজত করে এবং তার স্বামীর আনুগত্য করে, তবে সে জান্নাতের যেকোন দরজা দিয়ে নিজের ইচ্ছানুযায়ী সেখানে প্রবেশ করতে পারবে।"[ইবনু হিব্বান,মুসনাদে আহমাদ,মিশকাতুল মাসাবীহ:২৮১]

রাসুলুল্লাহ বলেন-

أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة.

"একজন নারীর উপর তার স্বামী সন্তুষ্ট থাকাকালীন সময়ে যদি সেই নারীর মৃত্যু হয় তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[সুনানু তিরমিজি :১১৬১।সনদ হাসান গরিব।]
রাসুলুল্লাহ বলেন-

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِح.َ

"যদি কোন স্ত্রীকে তার স্বামী সহবাসের উদ্দেশ্যে বিছানায় আমন্ত্রন জানায়, আর স্ত্রী তার স্বামীর অবাধ্যতা করে, অতঃপর স্বামী রাগান্বিত অবস্থায় সে রাত অতিবাহিত করে, তাহলে ফেরেশতাগণ সে নারীর প্রতি সুবহে সাদিক পর্যন্ত অভিসম্পাত দিতে থাকেন।"[সহিহ বুখারি:৩৬৩৭]

রাসুলুল্লাহ বলেন-

لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن

"যদি মানুষের ভেতর একে অপরকে সিজদা করার নির্দেশ থাকতো, তাহলে আমি নারীকে বলতাম তার স্বামীকে যেন সিজদা করে।"[সুনানু তিরমিজি, ইবনু হিব্বান,সুনানু দারেমি:১৫০৬।সনদ হাসান।]

যখন রাসুলুল্লাহ-কে প্রশ্ন করা হলো, 'কোন নারী সবচে' উত্তম?' তিনি জবাব দিলেন সেই নারী, যার স্বামী তার উপর সন্তুষ্ট। যে তার স্বামীর নির্দেশানুযায়ী কাজ করে এবং নিজের ব্যক্তিত্ব ও আচরণের ক্ষেত্রেও যে তার স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করে না[সুনানু তিরমিজি, সুনানু দারেমি:১৫৮৫]

সুতরাং যেসব স্ত্রীদের বৈবাহিক জীবনে সমস্যা রয়েছে, তাদের উচিত স্বামীর সাথে মানিয়ে চলার চেষ্টা করা এবং সুন্দর ও আনন্দঘন সম্পর্কের মাধ্যমে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করা।

. □ স্বামীর-আলয়ে অবস্থান। একেবারে জরুরী ব্যতিত এবং স্বামীর অনুমতি ব্যতিত তাঁর বাড়ি থেকে অন্যত্র না যাওয়া।

□ নিজের ঘর এবং সন্তানাদির প্রতি খেয়াল রাখা। হাদিসে আছে-রাসুল বলেছেন, 'স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের
জিম্মাদার। এ জিম্মাদারির ব্যাপারে তাকে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে।' [সহিহ বুখারি: ২৫৪৬]

৪. নিজের সতীত্ব হেফাজত করা। মনে রাখবেন-আপনার নিজের সতীত্ব রক্ষা করা আপনার দায়িত্ব। যদি আপনি স্বামীর অজান্তেও অন্য কোন পরপুরুষের সাথে দেখা-সাক্ষাত, ফোনালাপ বা যেকোনোভাবে নিজের সতীত্বের কালি মাখলে এর জবাব আল্লাহ-র কাছে আপনাকেই দিতে হবে।

এ ছাড়াও স্বামীর মন জয় করার আরো দিক রয়েছে। যেমন-তার সাথে হাসিমুখে কথা বলা। মলিন ও মিষ্টি করে ডাকা। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অগাধ ভালোবাসা থাকলে হবে না, স্বামীকে তা মন খুলে বলতে হবে। প্রতিটি স্বামীই চান স্ত্রী তাকে বলুক "আমি আপনাকে ভালোবাসি" বা এধরণের কোন শব্দ। লজ্জা ভুলে স্বামীকে কাছে টানুন। বলুন মনের কথা। হৃদয়ের ছোট্ট কুটিরে লুকিয়ে থাকা প্রতিটি অনুভূতির কথা স্বামীকে হৃদয়খুলে বলুন। মন-মেজাজ বুঝে টুকরো- টুকরো দুষ্টুমি করলেও স্বামীর হৃদয় জয় করা যায়।

একদিন আয়িশা(রা:) রাসুল(সা:)-কে জিজ্ঞেস করলেন- 'হে আল্লাহর রাসুল! আপনি আমাকে কতটা ভালবাসেন?'

রাসুল(সা:) বলেন-'তোমার আমার ভালোবাসার বন্ধনটা এমন শক্ত ও মজবুত, যেমন একটা রশির মধ্যে সুতাগুলো শক্তভাবে জড়িয়ে থাকে।' রাসুল(সা:)-এর জবাব শুনে আয়িশা খুব খুশি হলেন। এরপর থেকেই প্রায় আয়িশা(রা:)রাসুল(সা:)-কে এ প্রশ্ন করতেন- 'হে রাসুল! আপনি কি আমাকে আগের মতই ভালোবাসেন? ভালোবাসার বন্ধনটা কি আগের মতই আছে? নাকি হালকা হয়ে গেছে?' আয়িশার দুষ্টুমির জবাবে রাসুল(সা:) বলতেন-'তোমার আমার ভালোবাসার বন্ধনটা ঠিক আগের মতই আছে।'

উপার্জনের দায়িত্ব কার?

প্রশ্ন হতে পারে-তখন তার জীবিকার ভার কে নেবে? এটাই আমাদের ধর্মের স্বাস্থ্য। ইসলাম নারীকে জীবনের কোনো অধ্যায়েই জীবিকার ভার দেয়নি। ইসলামে জীবিকার ভার বরাবরই পুরুষের কাঁধে। নারী যখন কন্যা তখন তার ভার বাবার কাঁেধ। যখন যুবতী তখন তার ভার স্বামীর কাঁধে। তারপর যখন জননী তখন তার ভার সন্তানের কাঁধে। তার কাঁধে উপার্জনের ভার কখনোই জানামানি ইসলাম। কারণ এটা তার শরীর ও মানস পরিপন্থী। এই ভার বহনের অর্থেই পুরষকে বলা হয়েছে-

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُو
مِنْ أَمْوَالِهِم(ْ

পুরুষ নারীদের অভিভাবক। কারণ-আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু পুরুষগণ নিজেদের অর্থসম্পদ ব্যয় করে। [নিসা: ৪: ৩৪]

পুরুষ নারীর জীবিকার ভার বহন করবে-এই অর্থেই সে অভিভাবক। নারী ঘরের রানী। ঘর সামলানোই তার দায়। তাই বয়সের কোমল ও অবুঝ সিঁড়ি অতিক্রম করার পর জীবিকার ভার নিজের কাঁধে তুলে নিতে বলেছে পুরুষকে-নারীকে নয়। আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে জীবিকা লাভের যেসকল মাধ্যম ও উপকরণ দান করেছেন তন্মধ্যে সচেষ্ট উপার্জন অন্যতম পন্থা।

এছাড়া নারীদের উপর এই দায়িত্ব আসলে সমাজের চরম দূর্ভোগ সৃষ্টি হবে। পশ্চিমা দেশ গুলোতে নারী পুরুষের সমান অধিকারের স্লোগাল তুলে, পুরুষদের মেরুদণ্ডহীন বানিয়ে দিচ্ছে। যেহেতু পুরুষ নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল তাই উপার্যনের ভারও পুরুষদের বহন করতে হবে।

নারীর যাবতীয় প্রয়োজনের নিশ্চয়তা পুরুষরা নিজের উপার্জন কিংবা স্বীয় সম্পদের দ্বারা বিধান করে থাকে। মোটকথা: ইসলাম পুরুষকে নারীর নেতা বানিয়েছে। নারীর উপর কর্তব্য হচ্ছে,আল্লাহ তাকে তার স্বামীর যা আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন তার আনুগত্য করা। আর সে আনুগত্য হচ্ছে, সে স্বামীর পরিবারের প্রতি দয়াবান থাকবে,

স্বামীর সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে। স্বামীর পক্ষ থেকে খরচ ও কষ্ট করার কারণে আল্লাহ স্বামীকে স্ত্রীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন।

অর্থ উপার্জনের দায়িত্ব পুরুষের। যেমন: ব্যাবসা-বাণিজ্য, কৃষিকাজ, বা চাকরি-বাকরি করে অর্থ উপার্জন করা। এ সকল উপার্জনের ক্ষেত্রেই আয়ের জন্য অর্থ প্রয়োজন। কেননা, Money begets money টাকায় টাকা আনে। আপনি কাউকে টাকা ছাড়া বিশাল বাজার করতে দেবেন এটা কি হয়? কিছু অর্থ তাকে দেন আর বাকিটা সে উপার্জন করে নেবে। আর বাজারের লিস্ট যাকে দেবেন না, তাকেও কিছু গিফট হিসেবে দেন। তারও কিছু ইচ্ছে আহ্লাদ থাকতে পারে। যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে ওপরের গল্পে। অর্থাৎ, যার দায়িত্ব তাকে বেশি দেন, যার দায়িত্ব নেই তাকে কিছু অর্থ দেন; যাতে সে তার শখের জিনিস কিনতে পারে। মানুষের শখ বলে কিছু থাকে না? থাকে তো।

এখানে আপনার মনে বেশকিছু প্রশ্ন আসতে পারে বলে মনে হয়। মনে যে-প্রশ্নগুলো আসতে পারে তা হলো-

মেনে নিলাম যে, অর্থনৈতিক সকল সমস্যা থেকে নারীকে মুক্তি দিয়ে এর সকল দায়িত্ব পুরুষের কাঁধে তুলে দেওয়া হয়েছে। তো, এটা কি নারীর প্রতি করুণা নয়? নারী কি পুরুষের করুণা নিয়ে বেঁচে থাকবে? নিজের পায়ে কি দাঁড়াবে না? এতে কি তার মাথা নীচু হয়ে যাবে না?
প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, কোনো মেয়ের অর্থনৈতিক দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে এর সকল দায়িত্ব পুরুষের কাঁধে তুলে দেওয়া হয়েছে, এটা তার ওপর কোনো করুণা নয়; বরং তা নারীর অধিকার। আমরা জানি যে, অধিকার আর করুণা এক নয়। করুণাপ্রার্থী করুণা না পেলে তা পাওয়ার জন্য আইনগত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না; কিন্তু অধিকারবঞ্চিত ব্যক্তি তার অধিকার ফিরে পেতে আইনের সহায়তা চাইতে পারেন।

যেমন, আপনি কোনো ভিক্ষুককে দান করলেন। সেটা তার প্রতি করুণা। আপনি ভিক্ষুককে দান না করলে তা পাওয়ার জন্য সে আইনগত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে

পারবে না; কিন্তু আপনি চাকরি করে যে-অর্থ বা বেতন পান তা আপনার জন্য মালিকের পক্ষ থেকে করুণা নয়, বরং তা আপনার অধিকার। সে আপনাকে ঠিকমতো বেতন দিতে বাধ্য। না দিলে আপনি আইনের সহায়তা চাইতে পারেন।

ঠিক তেমনি নারীর জন্য পুরুষের থেকে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং নিরাপত্তা পাওয়াটা করুণা নয়, বরং এগুলো তার অধিকার। দায়িত্বশীল পুরুষ যদি তা পূরণ না করে তবে নারী চাইলে এগুলো পাওয়ার জন্য আইনের সহায়তা নিতে পারেন। এখানে একটু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, দায়িত্বশীল পুরুষ থাকতে ইসলাম কোনো বৃদ্ধাশ্রমকে সমর্থন করে না; বরং সরকার দায়িত্বশীল পুরুষকে দায়িত্বপালনে বাধ্য করবে। প্রয়োজন হলে সহযোগিতা দেবে। কারণ, বৃদ্ধাশ্রমে থাকা আর আপনজনের কাছে থাকা এক নয়। অনুভূতিটা সম্পূর্ণ আলাদা।

নারীর এই অধিকার পাওয়ার পদ্ধতিটা খুবই সুন্দর। যেমন ধরুন, চাকরির বেতন থাকে নির্ধারিত। তার চেয়ে বেশি সে পাবে না। এই বেতন তার জন্য যথেষ্ট কি না, শ্রমিকের মৌলিক অধিকার পূরণ হচ্ছে কি না-তা মালিক সব সময় ভেবে দেখেন না। যদিও মালিকপক্ষের সেটা খেয়াল রাখা উচিত। হতে পারে তার বেতন পনেরো হাজার টাকা; কিন্তু নিজের এবং পরিবারের সুন্দরভাবে চলতে প্রয়োজন বিশ হাজার টাকা।

অন্যদিকে নারীর বেতন নির্দিষ্ট দশ বা বিশ হাজার টাকা নয়; বরং তার যা লাগবে তাই স্বামী দেবে। এ যেন মালিক তার কর্মীকে কোনো বিশাল মার্কেটে নিয়ে বলছে-বেতন বাবদ তোমার যা যা লাগে সব নিয়ে নাও। কোনো রিস্ক নেই। ঠিক তেমনি স্ত্রীও তাই পাবে-যা তার লাগে। তবে বিলাসিতা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। স্বামীর আর্থিক অবস্থার ওপর নির্ভর করবে স্ত্রীর বিলাসিতা বা সবকিছুর মান। একজন নারী শুধু ঘরের কাজ করার পরও তার সবকিছু এবং স্বামীর থেকে সুন্দর আচরণ পাওয়ার পূর্ণ অধিকার রাখে। কারণ, গর্ভধারণ করতে, সন্তান লালন-পালন করতে, সাংসারিক কাজ করতে তাকে যথেষ্ট শ্রম দিতে হয়েছে, কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে।

কিছু লোক আছে, যারা বেতনের অঙ্ক হিসেবে ব্যক্তির কাজের মূল্যমান নির্ধারণ করতে আরাম বোধ করে। ফলে, নারীর বেতনহীন কাজ আর তাদের কাছে কাজ মনে হয়

না। গৃহকে নারীর কর্মস্থল মনে হয় না। তারা ভাবে, যে-কাজে বেতন নেই, সে কাজ কোনো কাজই না।

নিজের পরিবারের দেখাশোনা করা এবং তাদের বিভিন্ন ব্যয়ভার বহন করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এটা তো বরং আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা ও দান-সদকার চাইতেও অধিক পুণ্যের কাজ।

আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ বলেছেন:

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٍ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

'আল্লাহর রাস্তায় তুমি একটি দিনার খরচ করলে, গোলাম আজাদের জন্য একটি দিনার খরচ করলে, মিসকিনকে দান করার জন্য একটি দিনার খরচ করলে আর নিজ পরিবারের জন্য একটি দিনার খরচ করলে; এর মধ্যে পরিবারের জন্য খরচকৃত দিনারের প্রতিদান সবচেয়ে বেশি হবে। '[সহিহ মুসলিম: ২/৬৯২, হা. নং ৯৯৫ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত]

পরিচালনার দায়িত্ব নারীদের নাকি পুরুষদের?

القوامة (আল-কিওয়ামা) শব্দটির অর্থ হলো, কোনো বিষয়ের ব্যবস্থাপনা তার ভিত্তিপ্রস্তর প্রতিষ্ঠা করা। যেমন আমরা বলে থাকি : قام الرجل المرأة أو عليها পুরুষ মহিলার নেতৃত্ব দিল বা তাকে পরিচালনা করল।' অর্থাৎ পুরুষটি মহিলার সকল বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণ করল এবং তার তত্ত্বাবধান করল।

পুরুষদের পরিচালনার এ দায়িত্ব পাওয়ার বিষয়ে কুরআনে কারিমে ইরশাদ হচ্ছে:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء]

'পুরুষেরা নারীদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক। [সুরা আন-নিসা: ৩৪]

এ আয়াতটির মর্মার্থ হলো, পুরুষগণ নারীদের তত্ত্বাবধান ও ভরণপোষণ করার ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত। এটি পুরো জীবনব্যাপী একজন পুরুষের কাঁধে অর্পিত একটি শক্ত আমানত। এ দায়িত্ব পালনের জন্য ইসলাম পুরুষদের নির্বাচন করেছে। কেননা, সৃষ্টিগতভাবে পুরুষরাই কেবল এ দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত। এ বণ্টন কোনো পক্ষপাতিত্বের কারণে তো নয়ই; বরং এটিই এখানে সুষম বণ্টন হিসাবে পরিগণিত। কিন্তু সর্বদা ইসলামকে নিয়ে সমালোচনা করে বেড়ানো এক শ্রেণির অমানুষের নিকট অন্যতম আলোচ্য বিষয়ই হচ্ছে, নারীর ক্ষমতায়ন ও এ ব্যাপারে ইসলামের অবিবেচক বণ্টন!!

তা ছাড়া পরিচালনা বা তত্ত্বাবধান করার এ দায়িত্ব পুরুষদের মহান করে দেয় না, তাদের অতি উচ্চতায় পৌঁছে দেয় না। এমন নয় যে, দায়িত্ব পেয়েছে তো পুরুষ নারীর ওপর জোর-জবরদস্তি করতে পারে। ইসলামের দর্শনমতে এ দায়িত্ব তো একটি আমানত, যা আদায় করা অত্যন্ত কষ্টকর। যদি পুরুষ এ দায়িত্বে অবহেলা করে, তবে তার জন্য রয়েছে কঠোর সাবধানবাণী। যদি সে বাড়াবাড়ি বা ছাড়াছাড়ি করে, তবে তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

এ দায়িত্ব পুরুষের হলেও ইসলাম স্বামী-স্ত্রী উভয়কে তা আদায়ে পরস্পরের সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ দেয়। যেন স্বামীর জন্য এ গুরুদায়িত্ব পালন করা সহজতর হয়। এ দায়িত্বের মাঝে স্বৈরাচারী হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। পারিবারিক ও জীবনের বিবিধ বিষয়ে স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরামর্শ করবে। যেমন কুরআনে কারিমে পরস্পর পরামর্শের একটি দৃষ্টান্ত এভাবে বর্ণিত হয়েছে:

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

'কিন্তু যদি তারা পরস্পর পরামর্শ ও সম্মতি অনুসারে দুধ ছাড়াতে ইচ্ছা করে, তাতে উভয়ের কোনো দোষ নেই।'[সুরা আল-বাকারা:২৩৩]

পশ্চিমা দেশে নারীবাদীদের প্রভাব

পশ্চীমা দেশ থেকে একটি ধারনা দেয়া হচ্ছে তা হলো,পুরুষ যা পারে, নারীও পারে। ঘরে রাজত্ব করাকে তারা নীচু করে দেখছে। এতে করে যেমন পরিবার নষ্ট হচ্ছে তেমন সন্তানদের ভবিষ্যত হুমকির মুখে পরছে। পুরুষ যেমন একজন নারীর দায়িত্ব নিতে অয়ারে,নারীবাদীরা মনে করে,নারীও দায়িত্ব নিতে পারবে। এরা জানে না, ইসলাম পরিচালনা-তত্ত্বাবধানের মতো এ গুরুদায়িত্ব পুরুষকে কেন দিয়েছে। তাদের এ বিষয়ে কোনো জ্ঞান নেই যে, পুরুষ ও নারীর মাঝে শারীরিক, আত্মিক ও স্নায়বিক দিক থেকে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। এ বিচারে পুরুষগণ নারীদের চেয়েও বেশি উপযোগী হয়ে থাকে। কারণ, পুরুষগণ নারীদের চেয়েও অধিক শারীরিক শক্তি, আত্মিক বল ও স্নায়বিক শক্তির অধিকারী। পরিচালনার মতো কঠিন দায়িত্ব, বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত বিবিধ বিপদাপদের মোকাবেলায় দৃঢ় থাকার ক্ষেত্রে পুরুষ অধিক উপযুক্ত। আর এ সকল ক্ষেত্রে নারীদের ভয় ও বিহ্বলের শিকার হয়ে পড়ার আশঙ্কা প্রবল।

যারা নারীদের অধিকার নিয়ে বাড়াবাড়ি করে, তারা দাবি করে যে, মহিলারা ইসলামে নির্যাতিত এবং ইসলাম তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করে না। তারা কুরআন ও হাদীসের দলীলের বিরুদ্ধাচরণ করে। "সমতা"র নামে তারা আসলে নারী পুরুষের "সাদৃশ্যে"র দাবী করে। অথচ উত্তরাধিকার, শাসনভার ইত্যাদি নানা বিষয়ে নারী-পুরুষের মাঝে পার্থক্য থাকাটাই স্বাভাবিক। এমনকি তারা কখনো কখনো ব্যাপারটি এমন পর্যায়ে নিয়ে যায় যে, পুরুষদেরই নারীদের সাথে সমতা অর্জনের জন্য দৌড়াতে হয়!

নারীবাদীরা যেটাকে ঘটা করে ঘরবন্দী বলছে, তা মূলত ঘরবন্দী নয়; বরং তা নারীদের রক্ষণাবেক্ষণ। কারণ, কুরআন-হাদিস নারীদেরকে পুরুষদের থেকে অধিক আবৃত থাকতে বলেছে। বলেছে—নারীর সতর ও পর্দা পুরুষের চেয়ে অধিক। এজন্য প্রয়োজনে বাইরের কাজ করার অনুমতি থাকলেও ইসলাম নারীদের ঘরে অবস্থান করতেই উৎসাহিত করে।

নারী তুমি কেনো পুরুষ হতে চাও?

জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারী ও পুরুষ ভিন্ন বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। তাদের এ ভিন্নতার সব দিক নিয়ে আলোচনা করা রীতিমতো অসম্ভব। তবে এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা না করলেই নয়, তা হলো-নারী-পুরুষের প্রকৃতি ও গঠনের ভিন্নতা। এ ভিন্নতার ফলে তাদের কাজকর্মে বৈচিত্র্য দেখা যায়। নারীর গঠন, মানসিকতা ও অনুভূতি পুরুষের থেকে একদমই আলাদা। নারীদের সৃষ্টি করা হয়েছে পুরুষের সম্পূর্ণ বিপরীত একটি ভূমিকা পালনের জন্য।

নারী তার গর্ভে সন্তান ধারণ করে, সন্তান জন্ম দেয়। প্রজন্ম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাকেই প্রথম দায়িত্বশীল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। একজন মেয়ের কাছে যা গুরুত্বপূর্ণ, যা তার অনুভূতিতে প্রভাব ফেলে, তা কখনো কোনো ছেলের অনুভূতিতে প্রভাব ফেলবে না। একজন ছেলের প্রতি দ্বীন ও সমাজের যে প্রত্যাশা, একজন মেয়ের প্রতি সেই একই প্রত্যাশা করা হয় না। অন্যভাবে বললে, দ্বীন ও সমাজের প্রেক্ষাপটে মেয়েদের ভবিষ্যত-চিন্তা ছেলেদের মতো হওয়া সম্ভব নয়। মেয়েরা যে কাজে উপযুক্ত, তাদেরকে যেভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনাও সেভাবেই গড়ে তুলতে হবে।

একজন মেয়েকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিতে হবে পরিবার গঠনের দিকে। তার লক্ষ্য হওয়া উচিত সুখী, দ্বীনদার ও সৌহাদাপূর্ণ পরিবার গড়ে তোলা। এটিই তার প্রথম কাজ। দ্বিতীয়ত যে কাজটি প্রাধান্য পাবে, তা হলো-পড়াশোনার বিষয় নির্ধারণ। বিশ্ববিদ্যালয়ে তার পড়াশোনা হবে এমন কিছু নিয়ে, যা তার প্রকৃতির সাথে খাপ খায়। অথবা এমন কোনো বিষয়ে, যে বিষয়ে নারীদের প্রয়োজন রয়েছে; যেমন-শিক্ষাপ্রদান, চিকিৎসা প্রভৃতি। মেয়েদের এমনভাবে কর্মক্ষেত্র বেছে নেওয় উচিত, যা তার পরিবারের প্রতি দায়িত্বপালনে বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে না, বরং তার পরিবারগঠনে সহায়কের ভূমিকা পালন করবে। যেমন-একজন মেয়ের সিলিং মেকানিক্যাল বা ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়াশোনার সিদ্ধান্ত তাকে বাড়তি কোনো সুবিধা দেয় না, পরিবারগঠনে কোনো ভূমিকা রাখে না। অনুরূপভাবে তার জন্য সমীচীন নয় পশুচিকিৎসা বা কৃষিবিষয়ে পড়াশোনা করা।

সর্বোপরি মেয়েদের এমন বিষয়ে পড়াশোনা করা উচিত, যা তাদেরকে সার্বিক দিত দিয়ে দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলবে। ফলে এ পড়াশোনা তাদেরকে চাকুরির ব্যবস্থা করে না দিলেও, পারিবারিক দায়িত্বপালনে সহায়তা করবে। অর্থাৎ তারা যা পড়েছে, তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগের সুযোগ থেকে যাবে। প্রায়ই দেখা যায়, ক্যারিয়ার গঠনের গোলকধাঁধায় পড়ে মেয়েরা বিয়ের সময়কে পিছিয়ে দিচ্ছে। বিয়ের বদলে ক্যারিয়ারকে প্রাধান্য দিলে এমন সময় আসতে পারে, যখন আফসোস করে কোনো লাভ হবে না।

তাই মেয়েদের কখনোও ছেলেদের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। ছেলে ও মেয়েকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দায়িত্ব পালনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। ছেলেদের মতো হওয়ার প্রবণতা মেয়েদের জন্য কতটা ভয়াবহ হতে পারে, তা প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যসমাজের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। নারী-পুরুষ একই ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার কারণে সেসব সমাজের ভারসাম্য এখন হুমকির মুখে।

তাই মেয়েদের বিয়ের মাধ্যমে ইসলামি পরিবার গঠন ও সন্তানদের যথাযথভাবে লালনপালনকেই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। সামাজিক মর্যাদা বা চাকুরি এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। গুরুত্বপূর্ণ হলো, একজন নারী কোন কাজের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত।

ভুলে গেলে চলবে না, নারিত্ব কোনো দুর্বলতা নয়, বরং নারিত্ব-ই নারীর সবচেয়ে মোক্ষম অস্ত্র। সুতরাং একজন নারী এমন কাজ, পদক্ষেপ বা পর্যায়ে কেন যাবে, যা তার নারিত্বের বিপরীত?

ইসলামে নারীদের উপর পুরুষ কর্তৃত্বশীল কেন?

ইসলাম নারীকে দিয়েছে ইহকালীন জীবনের সার্বিক নিরাপত্তা এবং পরকালীন জীবনে মুক্তির নিশ্চয়তা |শুধু নারী কেন ? নারী -পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই ইসলামের মৌলিক বার্তা হলো-সমগ্র মানবকূলের মস্তিক চেতনাকে পরিছন্ন রাখা | যাতে করে অন্যায়, অত্যাচার, পাপ, রাহাজানি ইত্যাদী থেকে মানুষ বিরত থাকতে পারে। যদিও বর্তমান সমাজে পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের নৈতিক চরিত্রকে সমুন্নত রাখতে প্রধান অন্তরায় হিসেবে সামনে দাড়িয়েছে। তথাপি এটাও সত্য যে, আমরা চাইলে সেটাকে বর্জন করে ইসলামের সৌন্দর্য কে সকলের দারপ্রান্তে পৌছে দিতে পারি।এর জন্য প্রয়োজন শুধু সমাজ-তথা মানুষের কল্যাণের জন্য নিজেকে আত্মনিয়োগ করা |ইসলাম চায় একজন নারীকে যথাযথ মর্যাদারর আসনে সমাহীন করতে, আর পাশ্চাত্য সভ্যতা চায় নারীকে অর্ধলুঙ্গ করে পতিতার স্থানে বসিয়ে পতিতাবৃত্তি করতে ;

যার প্রমাণ -

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা বলেন- " আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হতে চান !

وَ اللّٰهُ يُرِيۡدُ اَنۡ يَّتُوۡبَ عَلَيۡكُمۡ ۟ وَ يُرِيۡدُ الَّذِيۡنَ يَتَّبِعُوۡنَ الشَّهَوٰتِ اَنۡ تَمِيۡلُوۡا مَيۡلًا عَظِيۡمًا ﴿۲۷﴾

আর যারা কামনা বাসনার অনুসারী - তারা চায় যে, তোমরা পথ থেকে অনেক দুরে বিচ্যুতি হয়ে পরো |[সূরা : নিসা-২৭]

এখন ভেবে দেখুন !

সমাজ বিবর্তন ও পাশ্চাত্যের এই অশ্লীল বেহায়াপনাকে যদি আমাদের পরিবার, সমাজ,এমনকি রাস্ট্রের সকল স্তর থেকে বিতারিত করতে না পারি, তাহলে আমাদের অদূর প্রজন্ম কোথায় গিয়ে দাড়াবে ?

যদি এখনি আমরা সচেষ্ট না হই তাহলে এমন এক সময় আসবে যেদিন-

শিষ্টচার, মানবিক মূল্যবোধ ও নীতি- নৈতিকতা হয়ে যাবে অবচেতন |

তাই - বাস্তব জীবনে আমাদের সামাজিক বন্ধন অটুট রাখতে এবং নৈতিক অবক্ষয়কে প্রতিরোধ করতে প্রয়োজন নারী পুরুষ উভয়কে সমন্বয়িত প্রচেষ্টা অব্যহত রাখা |

আর এই প্রচেষ্টার পরিচালক হবেন পুরুষ এবং নারীরা হবেন উৎসাহ, অনুপ্রেরণার মডেল |

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে পুরুষেরা কেন পরিচালক হবেন ?
নারীরা কম কিসে !
এমন প্রশ্ন করাটাই সাভাবিক তবে এমন প্রশ্নের রুপকার হলো-নারী অধিকার আন্দোলনের ফেরীওয়লারা।

যারা শুধু নারী অধিকারের নামে নারীকে ঘর ছাড়াই করতে পেরেছে | তারা কোন নারীকেই সফলতার পথ দেখাতে পারেনী | বরং পর্যায়ক্রমে তারা প্রতিনিয়ত আল্লাহর পবিত্র কালামকে অবমাননা করে চলছে।
আল্লাহ্ পাক বলেন-

الرجال قومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصلحت قنتت حفظت للغيب بما حفظ الله و التى تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن فى المضاجع و اضربوهن ۚ فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا ٣٤

" পুরুষেরা নারীর উপর কর্তৃত্বশীল এই জন্য যে, আল্লাহ্ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন । এবং এজন্য যে তারা তাদের জন্য (নারীর) অর্থ ব্যায় করে । সে জন্য নেককার স্ত্রীগণ হয় অনুগতা এবং আল্লাহ্ যা হেফাজত যোগ্য করে দিয়েছেন - লোক চক্ষুর অন্তরালে তা হেফাজত করে | [সূরা : নিসা -৩৪]
হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা স্ত্রীর প্রয়োজনে ব্যয় করার ব্যাপারে স্বামীকে দায়িত্বশীল করেছেন। কারণ, স্বামীকে তিনি দিয়েছেন পুরুষসুলভ গুণাবলি, ধৈর্য ও শক্তি- সামর্থ্য। স্ত্রীকেও তিনি করেছেন দায়িত্বশীল-স্বামীর সন্তানাদির দেখাশোনা ও লালনপালনের ব্যাপারে, তাদের আদব-কায়দা ও আচার-সংস্কৃতি শিক্ষাদানের ব্যাপারে, স্বামীর ঘরের কাজকর্মের ব্যাপারে এবং আল্লাহ তাআলা তাকে যে স্বভাবপ্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন (যেমন: নারীত্ব, দুর্বলতা, ধৈর্য ও মমতা) এগুলোর মাধ্যমে স্বামীকে সুখ ও আনন্দ দানের ব্যাপারে। অতএব, নর ও নারী উভয়েরই রয়েছে দায়িত্ব ও কর্তব্য। নবের যা দায়িত্ব, তা করার সামর্থ্য নারীর নেই। আবার নারীর যা দায়িত্ব, তা সম্পাদনের ক্ষমতাও নারীর নেই।

কিন্তু মানবিক স্বভাবপ্রকৃতির রীতিনীতি থেকে যারা বিচ্যুত, দৃষ্টি ও বোধশক্তির অন্ধত্ব যাদের আক্রান্ত করেছে, তারা নারী স্বাধীনতা ও নবের সঙ্গে তার সমতার দাবি করে। কোন সমতার দাবি তারা উত্থাপন কবে? জানি না। আমরা নারীকে দেখি পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে, ফুটবল খেলা ও কুস্তি ইত্যাদি চর্চা করতে, পুরুষের কাজে নির্লজ্জভাবে অংশগ্রহণ করতে, রাস্তাঘাট ও অলিগলিতে তার সঙ্গে মিলেমিশে চলাফেরা করতে। এভাবে সে সমাজটা কলুষিত করার পেছনে ড. মিকা রাখে। সাজসজ্জা, সৌন্দর্য প্রদর্শন, নরের সঙ্গে একান্তে মিলন ও কণ্ঠস্বরের কোমলকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে গতানুগতিকতার অনুসরণ করে সে সমাজে অশ্লীলতা ও অশালীনতার বিস্তার ঘটায়।

জানি না, কেন সে এগুলো করে।

পুরুষকে আকৃষ্ট করে বিবাহে প্রবৃত্ত করার জন্য?

নাকি সমতা ও প্রতিযোগিতার অনুরাগে?
নাকি ছলনার মাধ্যমে পুরুষকে প্রলুব্ধ ও আকৃষ্ট করে ধ্বংস করার জন্য?

ইসলাম তো নারীকে দিয়েছে সম্মান এবং কষ্ট থেকে পরিত্রাণ, নারীর ব্যয়ের ভার পুরুষের ওপর অর্পণের মাধ্যমে। তাহলে কেন এ ঔদ্ধত্য, কেন এ অবাধ্যতা, কেন এ অকৃতজ্ঞতা?

পুরুষ নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল এর কারন

পুরুষগণ মহিলাদের কর্তা, নেতা, শ্রেষ্ঠ হাকিম এবং যখন অবাধ্য হবে তখন আদব শিক্ষা প্রদানকারী।

এর কারণ দুটি:

১. আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত শ্রেষ্ঠত্ব, আল্লাহ তা'আলা নিজেই পুরুষদেরকে মহিলাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। পুরুষদের দৈহিক শক্তি, কর্মক্ষমতা, সাহস ও ধৈর্য ইত্যাদি নারীদের থেকে বহুগুণে বেশি দিয়েছেন। ফলে পুরুষদের দ্বারা যে কাজ হয় নারীদের দ্বারা সেরূপ কাজ হয় না। এজন্য নবুওয়াত কেবল পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অনুরূপভাবে রাজত্ব পরিচালনা করাও পুরুষদের হাতেই। কারণ পুরুষের শাসনে রাষ্ট্রে যে নিয়ম-শৃঙ্খলা বহাল থাকবে, নারী পরিচালিত রাষ্ট্রে তা বহাল থাকবে না।

তাই যখন রূমবাসী তাদের প্রেসিডেন্ট মহিলাকে নির্বাচিত করল তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً

এমন জাতি কখনো সফলকাম হবে না যারা তাদের নেতৃত্বের দায়িত্বভার কোন মহিলার ওপর অর্পণ করে। [সহীহ বুখারী হা: ৪৪২৫]

২. পুরুষদের স্ব-উপার্জিত সম্পদ দ্বারা ব্যয়ভার বহন করে। একজন নারীকে ইসলাম উপার্জনের নির্দেশ দেয়নি। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করবে স্বামী আর স্বামীর ঘর সংরক্ষণ করবে স্ত্রী। একজন নারী যদি অর্থ উপার্জন করতে যায় তাহলে সাংসারিক, সন্তান-সন্ততি ও দৈহিক এবং ধর্ম-কর্ম ইত্যাদি সর্বদিক থেকে সমস্যা সৃষ্টি হবে।

উপসংহার

আল্লাহ পৃথিবীতে নারী-পুরুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত করার জন্য। কিন্তু নারী-পুরুষের সৃষ্টি কৌশলে তারতম্য রয়েছে। এজন্য যে, তারা যেন একে অপরের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে। শক্তি-সামর্থ্য পুরুষের বেশী, বুদ্ধিমত্তায়ও পুরুষ অগ্রগামী। তাই পৃথিবীতে নেতৃত্ব দেয়া ও কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য পুরুষকেই দায়িত্ব দিয়েছেন। পুরুষ সে দায়িত্ব পালন না করলে কিংবা সে দায়িত্ব অন্য কেউ হরণ করলে, পৃথিবীতে শান্তি আসতে পারে না। বজায় থাকতে পারে না স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা। দূরীভূত হতে পারে না অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা। বর্তমানে পৃথিবীর বহু দেশে নারী নেতৃত্ব দিচ্ছে। পুরুষরা তাদের গোলামে পরিণত হয়ে জীবন যাপন করছে। এর কারণে পৃথিবীর শান্তি আজ দূরীভূত হয়েছে। সর্বত্র হানাহানি, খুনাখুনি বিরাজ করছে। এই অরাজক পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে পুরুষকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদর্শে আদর্শবান হয়ে নিজেদের কর্তৃত্ব ফিরিয়ে আনতে হবে। তাহলে পৃথিবীর যাবতীয় অশান্তি, অরাজকতা দূরীভূত হবে। ফিরে আসবে শান্তি ও স্থিতিশীলতা। পৃথিবীর সর্বত্র সম্ভব না হলেও অন্ততঃ মুসলিম দেশের মুসলিম নাগরিকদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদর্শে তথা ইসলামের আদর্শে আদর্শিত হয়ে তাদের হারানো কর্তৃত্বকে ফিরিয়ে আনতে হবে। তাহলে তাদের নিজের জীবনে এবং দেশ ও জাতির মধ্যে ফিরে আসবে শান্তি।

সাথে সাথে নিজেদের আক্বীদা-বিশ্বাস ও আমলকে ঢেলে সাজাতে হবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ তথা অহি-র আলোকে। বিজাতীয় কৃষ্টি-কালচার, সংস্কৃতি ও আদর্শের অনুসরণ ও অনুকরণ নয়; বরং ইসলামের বিধানকে মেনে নিয়ে জীবনের সকল দিক ও বিভাগে কাজ করতে পারলে ইহকাল ও পরকাল সুন্দর ও সুখময় হবে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, পুরুষ হচ্ছে স্ত্রীর নেতা। সে স্ত্রীকে সোজা ও ঠিক-ঠাককারী। কেননা, পুরুষ স্ত্রীর উপর মর্যাদাবান। এ কারণেই নবুওয়াত পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। অনুরূপভাবে শরীয়তের নির্দেশ অনুসারে খলীফা একমাত্র পুরুষই হতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "ঐ সব লোক কখনও মুক্তি পেতে পারেন না যারা কোন নারীকে তাদের শাসনকর্ত্রী বানিয়ে নেয়। (সহীহ বুখারী) এরূপভাবে বিচারপতি প্রভৃতি পদের জন্যেও শুধু পুরুষেরাই যোগ্য। নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা লাভের দ্বিতীয় কারণ এই যে, পুরুষেরা নারীদের উপর তাদের মাল খরচ করে

থাকে, যে খরচের দায়িত্ব কিতাব ও সুন্নাহ তাদের প্রতি অর্পণ করেছে। যেমন মোহরের খরচ, খাওয়া পরার খরচ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচ। সুতরাং জন্মগতভাবেও পুরুষ স্ত্রী অপেক্ষা উত্তম এবং উপকারের দিক দিয়েও পুরুষের মর্যাদা স্ত্রীর উপরে। এ জন্যেই স্ত্রীর উপর পুরুষকে নেতা বানানো হয়েছে।

তথ্যসূত্র

1. কুরআন শরীফ
2.মুসলিম শরীফ,
3.বুখারী শরীফ,
4.বিভিন্ন সম্পাদনের বই থেকে প্যারা,
5.Facebook
6.Google